দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

ইসলামি সন্ত্রাসের থাবায় বিপন্ন মানবতা

—পৃঃ ...১১

ভারতের বহিরাগত আত্মীয়

—পৃঃ ...১৩

৬৮ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা।। ১ আগস্ট ২০১৬।। ১৬ শ্রাবণ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

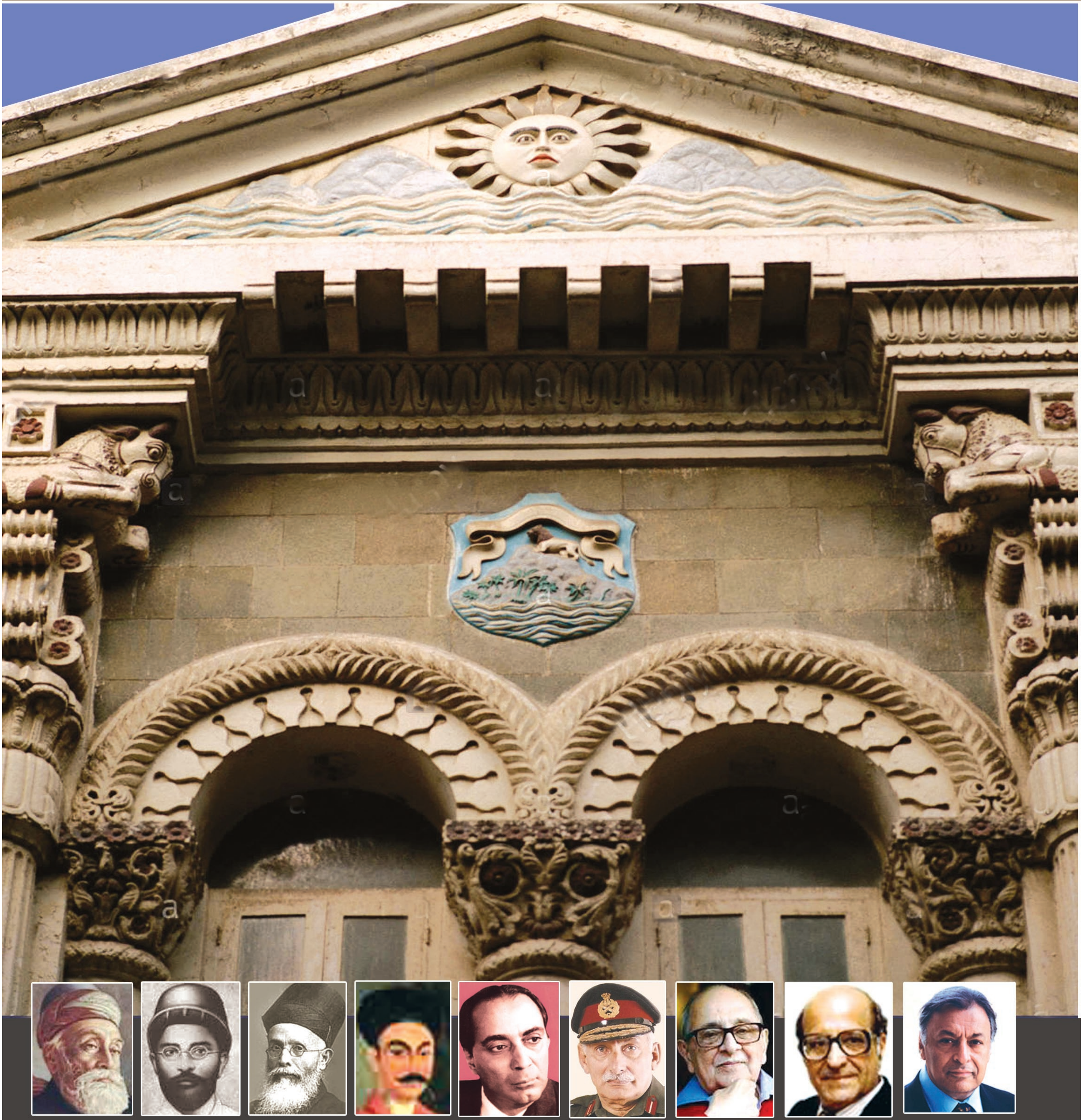

ভারতের বহিরাগত আত্মীয়

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা, ১৬ শ্রাবণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

১ আগস্ট - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

খোলা চিঠি : লেনিনগ্রাদে বসে বাংলার রাজনীতি, দেখুন টিকিট ছাড়াই □ সুন্দর মৌলিক □ ৯

মমতা যত বেশি মুসলমান তোষণ করবেন তত বেশি হিন্দু ভোটদাতাদের সমর্থন হারাবেন □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

ইসলামি সন্ত্রাসের থাবায় বিপন্ন মানবতা : ইসলাম মানে শান্তি, এই ধারণাটাই বদলে দিচ্ছে আইসিস □ সাধনকুমার পাল □ ১১

ভারতের বহিরাগত আত্মীয় □ সন্দীপ চক্রবর্তী □ ১৩

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক দলের ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি □ বিপ্লব বসু □ ২০

সংখ্যাতত্ত্বে হিন্দু ঐতিহ্য অষ্টকৌণিক স্থাপত্যশৈলী □ ওমপ্রকাশ ঘোষ □ ২১

জাকির নায়েককে নিয়ে ঘনিয়ে ওঠা সমস্যা □ ড. জিনাত শওকত □ ২৭

এ তুমি কেমন মাদার! □ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল □ ২৯

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দুত্বের অবস্থান আরও দৃঢ় হলো □ চিন্ময় ভট্টাচার্য □ ৩২

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □ **অন্যরকম : ৩৩** □ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৭** □ **রঙ্গম : ৩৮-৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪০** □ **চিত্রকথা : ৪১** □ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

প্রচ্ছদ পরিচিতি : মুম্বইয়ের একটি পারসি মন্দির।

নীচে : নয়জন বিশিষ্ট পারসি।

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৮ই আগস্ট, '১৬

প্রকাশিত হবে
৮ই আগস্ট '১৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মহাকাশে ভারতের উজ্জ্বল উপস্থিতি

ভারতের প্রথম উপগ্রহ আর্যভট্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের হাত ধরে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিল। এখন অনেক কম খরচে নিজেদের তো বটেই বিদেশেরও উপগ্রহ উৎক্ষেপণে সমর্থ হয়েছে ভারত। মঙ্গলযান ও চন্দ্রযান উৎক্ষেপণেও বিশ্বের নজর কেড়েছে। এই নিয়েই এবারের বিশেষ বিষয় : মহাকাশে ভারতের উজ্জ্বল উপস্থিতি।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কাশ্মীর উপত্যকায় শান্তির আগ্রহ

জঙ্গি নেতা বুরহান ওয়ানির মৃত্যুর পর অশান্ত কাশ্মীর উপত্যকায় ক্রমাগতই উসকানি দিয়া চলিয়াছে পাকিস্তান। পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে এক সভায় চরম উসকানি দিয়া পাক প্রধানমন্ত্রী শরিফ বলিয়াছেন, কাশ্মীর একদিন পাকিস্তানের অংশ হইবে। তাঁহারা সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। প্রত্যুত্তরে ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ সাফ জানাইয়া দিয়াছেন যে, পাক প্রধানমন্ত্রীর কাশ্মীর দখলের স্বপ্ন কোনোদিনই পূরণ হইবে না। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভারতেই থাকিবে। যে দেশ নিজের নাগরিকদের বিরুদ্ধে ট্যাঙ্ক, বোমারু বিমান ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই পাকিস্তান এখন কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর আচরণ লইয়া প্রশ্ন তুলিতেছে। বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ইহা দুর্ভাগ্যজনক বলিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা যথার্থ।

ইতিমধ্যে তুলনামূলক ভাবে কাশ্মীরের পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় স্থানীয় রাজনৈতিক দল ও সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করিয়া গিয়াছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে তিনি আবেগাত্মক একতার উপরই জোর দিয়াছেন। বস্তুত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফর তখনই ফলপ্রসূ হইবে যখন তাহা লইয়া সংকীর্ণ রাজনীতি হইবে না। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে কংগ্রেস একের পর এক প্রস্তাব দিলেও তাহাদের নেতারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহিত দেখা করিতে চাহেন নাই। স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরমের নজির টানিয়া রাজনাথ সিং-য়ের সহিত দেখা করিতে চাহেন নাই। এইসব দেখিয়া মনে হইতেছে পিডিপি নেতৃত্বাধীন জম্মু-কাশ্মীর সরকার উপত্যকার অধিবাসীদের আশ্বস্ত করিতে পারে নাই। যে বিপুল ভোটে পিডিপি রাজ্য বিধানসভা ভোটে জয়লাভ করিয়াছিল, তাহা এখন অনেকটাই শিথিল হইয়া গিয়াছে, বিশেষত মেহবুবা মুফতির মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর। জঙ্গি বুরহান ওয়ানির নিহত হইবার পর উপত্যকায় যে বিক্ষোভ-অশান্তি শুরু হইয়াছিল তাহা রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে নাই। মেহবুবা মুফতি-সরকারের প্রশাসন লইয়া তাই প্রশ্নচিহ্ন উঠিয়াছে। বিক্ষুব্ধ জনতার ভিড় হইতে জঙ্গিদের পাথর ছোড়ার মোকাবিলা করিতে নিরাপত্তা কর্মীরা গুলি চালাইতে বাধ্য হয়। এর ফলে কিছু মানুষ নিহত ও আহত হয়। কিন্তু এই কারণে নিরাপত্তা রক্ষীদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাইবার যে চেষ্টা চলিতেছে তাহা তোষণনীতির নামান্তর মাত্র।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথামতো উপত্যকায় এই হিংসাত্মক ঘটনার ফলে দুই হাজারেরও বেশি পুলিশকর্মী এবং এক হাজার একশো সিআরপিএফ জওয়ান আহত হইয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্য আরও দুই হাজার তিনশো জন ঘায়েল হইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইল, এই 'অন্য'দের মধ্যে যে একটি বড় অংশই পাথর ছুড়িয়াছে তাহা কেহই উল্লেখ করিতেছে না। নিরাপত্তাকর্মীদের আরও সংযম দেখানোর কথা বলা হইলেও পাথর ছোড়া ঠিক কাজ হয় নাই—এমন কথা কিন্তু কেহ বলিতেছেন না। যদি পাথর ছোড়া না হইত তবে নিরাপত্তা কর্মীরা শেষ উপায় হিসাবে ছররা গুলি ছুড়িতে বাধ্য হইত না। উপত্যকার অশান্তি মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট সকলপক্ষের সঙ্গে আলোচনা-সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করা হইবে বলিয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার একটাই শর্ত—এইসবই হইবে উপত্যকায় শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হইবার পর। উপত্যকায় শান্তির পরিবেশ ফিরাইয়া আনিবার জন্য কেন্দ্র সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপের উপর নির্ভর করিতেছে, ভাবনা ছাড়িয়া প্রথমে তাহাদিগকেই আগাইয়া আসিতে হইবে। এই বিষয় মুফতি সরকার ও তাঁহার সঙ্গীদেরই প্রথমে সক্রিয় হইতে হইবে। অশান্তি সৃষ্টিকারী স্থানীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় করিয়া দিতে হইবে। যদি পিডিপি নেতারা মনে করিয়া থাকেন বিচ্ছিন্নতাবাদী ও পাকিস্তানের প্রতি নরম মনোভাব বজায় রাখিবেন এবং একই সঙ্গে কেন্দ্রের সহায়তা প্রত্যাশা করিবেন—এইরকম দ্বিচারিতার সুযোগ গ্রহণ করিতে পাকিস্তান যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিবে না তাহা বলাই বাহুল্য। কাশ্মীর উপত্যকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার আগ্রহ থাকিলে এই দ্বিচারিতা অবিলম্বে বর্জন করিতে হইবে।

সুভাষিতম্

গতে শোকো ন কর্তব্যো ভবিষ্যং নৈব চিন্তয়েৎ।
বর্তমানেন কালেন বর্তয়ন্তি বিচক্ষণাঃ।।

গত হওয়া সময়ের জন্য শোক করা উচিত নয় এবং ভবিষ্যতের জন্য ব্যাকুল হওয়ার প্রয়োজন নেই। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বর্তমানেই করণীয় কাজ করে থাকেন।

সীমান্তে বেড়া না থাকায় অবাধ গোরুপাচার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিএসএফ কর্তারা রীতিমতো উদ্বিগ্ন। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কয়েকটি জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া না থাকায় অবাধে চলছে গোরুপাচার। তবে তাদের উদ্বেগের প্রধান কারণ গোরুপাচারের আড়ালে জঙ্গি বিনিময়। যা ক্রমশ বাড়ছে বলে খবর।

মালদা সীমান্তের কালিয়াচক, দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি গোরু পাচারের করিডোর হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে কুখ্যাত। বিএসএফ টহলদারি ধরপাকড় বাড়ানোর ফলে এখন দুষ্কৃতীরা উত্তর দিনাজপুরের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি গোরুপাচারের জন্য বেছে নিয়েছে। বিএসএফ সূত্রের খবর, উত্তর দিনাজপুরের করিডোরটির আয়তন ১২ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে রয়েছে গোয়ালপোখর থানার ফুলবাড়ি, রায়গঞ্জ থানার ভাটোল ও বিন্দোল, হেমতাবাদ থানার চৈনগর ও মাকড়হাট এলাকা। বর্ষাকাল গোরু পাচারকারীদের পছন্দের সময়। বাংলাদেশের কুলিক নদী যেখানে ভারতে প্রবেশ করেছে সেখানে কাঁটাতারের বেড়া নেই। আবার নাগর নদীর কিছু অংশ বাংলাদেশের ওপর দিয়ে গেছে। তাই বর্ষাকালে এই অঞ্চলে করিডোর তৈরি করে পাচারকারীরা। বিহারের বিভিন্ন হাট থেকে গোরু কিনে তারা পাঠিয়ে দেয় উত্তর দিনাজপুরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। ঢাকা গাড়ি, ভেতরে কী আছে কিছু দেখা যায় না। ট্রাক চলে যায় নির্দিষ্ট জায়গায়। পাচারকারীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে সাঙ্কেতিক ভাষায়। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার এপারের পাচারকারীরা ওপারের পাচারকারীদের মতোই বাংলাদেশের সিমকার্ড ব্যবহার করে। যার ফলে এদের কল ট্র্যাক করাও কঠিন হয়ে ওঠে বলে জানিয়েছেন এক বিএসএফ কর্তা।

তবে বিএসএফের চরমতম উদ্বেগের কারণ গোরুপাচার নয়, জঙ্গি বিনিময়। নাশকতা চালাবার জন্য 'নতুন মুখ' দরকার। তাই ভারতের বহু তরুণকে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জঙ্গি বিনিময়েরও প্রধান করিডোর হয়ে উঠেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চল। সম্প্রতি বেশ কয়েকজনকে পাঠানো হয়েছে। তাদের দিয়ে বাংলাদেশে হামলা চালানো হতে পারে বলে গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে। আবার একইভাবে বাংলাদেশের পলাতক জঙ্গিরা ভারতে প্রবেশ করেছে। এই জেলার রাধিকাপুর ও ছোট ফুলবাড়ি সীমান্ত 'সেফ করিডোর'। বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলা থেকে পাকুড়ায় যাওয়ার খরচ মাত্র ১০ টাকা। সেখান থেকে ২ কিলোমিটার দূরে ঠনঠনিয়াপাড়া। ভাড়া মাত্র ৫ টাকা। তারপর পিচ রাস্তা ধরে বাংলাদেশের দালালের বাড়ি। ভারতীয় দালালের সঙ্গে কথাবার্তা বলে রাতারাতি ভারতে প্রবেশ।

উত্তর দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার ভরত রাঠোর জানান, পাচার হওয়ার আগেই সম্প্রতি ৯৩০টি গোরুকে রাস্তা থেকে আটক করা হয়েছে। সীমান্তবর্তী গ্রামে নিয়মিত পুলিশি টহল চলছে। সীমান্তে কাঁটাতার কাটার অত্যাধুনিক যন্ত্র উদ্ধার করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। বিএসএফের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, গত ১৮ জুন ৪৭টি গোরু উদ্ধার, ১৪ জন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার এবং ২টি ট্রাক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। নিয়মিত চলছে পাচারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান। কিছুদিন আগে কাঁটাতার কেটে গোরু পাচারে বাধা দিলে সীমান্তে কর্মরত জওয়ানকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় পাচারকারীরা। তাতে ওই জওয়ান আহত হন। পরে অবশ্য অন্য আউটপোস্ট থেকে বি এস এফ জওয়ানরা ঘটনাস্থলে গিয়ে গুলি করে মেরে ফেলে এক পাচারকারীকে।

তিন চীনা সাংবাদিককে বহিষ্কার করল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চীনের বিখ্যাত (ঝিনহুয়া) সংবাদ সংস্থার সঙ্গে জড়িত ভারতস্থিত ৩ জন প্রবীণ চীনা সাংবাদিককে দেশ থেকে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লী। দেশের সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থার তরফে পাওয়া হুঁশিয়ারির কারণেই এই বিতাড়ন বলে মনে করা হচ্ছে। ঝিনহুয়া সংবাদ সংস্থার দিল্লীস্থিত ব্যুরো চিফ উয়ো জিয়াং ও তাঁর দুই সহযোগী মুম্বই-য়ে কাজ করা সহকারী লু টাং ও সি ইয়ংগ্যাঙকে আগামী ৩১ জুলাই-য়ের মধ্যে ভারত ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অভিজ্ঞ মহলের মত অনুযায়ী দেশের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো চীনা সাংবাদিকদের দেশ ছাড়ার হুকুম দিল কেন্দ্র।

নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুযায়ী দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির দেওয়া রিপোর্ট মোতাবেক এঁরা নাম ভাঁড়িয়ে দেশের বিশেষভাবে সংরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে ঢুকে পড়েছিলেন। যেগুলি আদৌ তাঁদের প্রবেশের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। এরই পরিণামে তিন সাংবাদিকের ভিসা ইতিমধ্যে বাতিল করা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্যুরো প্রধান উয়ো জিয়াং বর্ধিত ভিসার ভিত্তিতে গত ৬ বছর ধরে ভারতে রয়েছেন। তাঁর দুই সহকর্মীদের ক্ষেত্রেও অতীতে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। চীনে সরকারের মুখপত্র হিসেবে ঝিনহুয়া সংবাদ সংস্থা অত্যন্ত প্রভাবশালী। সংবাদ সংস্থার প্রধান অধিকর্তা পদাধিকার বলে শাসক কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। চীনে অবস্থিত জিনতায় সংবাদ সংস্থার দপ্তর থেকে এই সফরের সত্যতা স্বীকার করে নেওয়া হলেও ভারতের বিদেশমন্ত্রক এ বিষয়ে মুখ খোলেনি।

আন্দাজ করা হচ্ছে, এনএসজি দেশগুলির সদস্য হওয়া নিয়ে চীনের লাগাতার অযৌক্তিক ভারত বিরোধী অবস্থানে ঘনিয়ে ওঠা তিক্ততাই কেন্দ্রকে এই চরম সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

মালদায় বেআইনিভাবে পোস্ত চাষ হলেও বাজারে বিকোচ্ছে না

সংবাদদাতা ॥ সম্প্রতি মালদা শহর জুড়ে কালো পোস্ত সহজলভ্য হয়ে পড়েছে। বাজারের পোস্তের চাইতে অনেক কম দামের এই পোস্ত গ্রাম ও শহরে পাওয়া যাচ্ছে। একবার এই পোস্ত কেনার পর দ্বিতীয়বার ক্রেতারা অবশ্য এই পোস্তর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। কেননা স্বাদে এই পোস্ত মোটেও আসল পোস্তর মতো নয়। মালদা জেলার কালিয়াচক ১, ২, ৩ এবং ইংলিশ বাজারে ব্যাপক পোস্ত চাষ হওয়াতে আঠা বের করে নেওয়ার পর এই সব কালো পোস্ত বাজারে আসছে। পোস্তর আঠা থেকে বিভিন্ন প্রকার মাদক দ্রব্য তৈরি হচ্ছে। সম্প্রতি কালিয়াচকে এইরকম আঠা হিরোইন সমেত মাদককারবারির একটি চক্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তবে উদ্বেগের বিষয়, পোস্ত চাষ বন্ধ করার এবং ক্রয় বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা নিয়ে রাজ্য সরকার ও আবদারি দপ্তরের ভিন্ন সুর শোনা যাচ্ছে। আবগারি দপ্তরের বক্তব্য— তারা বেআইনি পোস্ত চাষে যুক্ত ব্যক্তিদের মাঝে মধ্যে ধরছে এবং জমির পোস্ত নষ্ট করে দিচ্ছে। ২০১৫-১৬ আর্থিক বর্ষে মালদা জেলায় ২৫ হাজার হেক্টর জমির পোস্ত নষ্ট করেছে জেলা প্রশাসন। তা সত্ত্বেও আরও অনেক জমির পোস্ত যেগুলি মূলত আফিং তৈরিতে ব্যবহার হয় সেগুলি অক্ষত থেকে যাচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলির প্রচ্ছন্ন মদতে সেই পোস্ত থেকে মাদক দ্রব্য সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে। আবার কৃষিদপ্তর থেকে বলা হচ্ছে, বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের দেখার কথা। কিন্তু ঘটনা হলো, এর ফলে সাধারণ মানুষ এবং যুব সম্প্রদায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এমনিতে মালদা জেলায় কোনো কাজ না থাকায় হাজার হাজার মানুষ ভুটান-সহ প্রতিবেশী দেশে কাজের আশায় ছুটছে। কালিয়াচক এবং ইংলিশ বাজারের কৃষকেরা জমিতে ফসল না লাগিয়ে অধিক মুনাফার লোভে অসাধু ব্যবসায়ীদের ফাঁদে পড়ে হাজার হাজার বিঘে জমিতে বেআইনি আফিং চাষ করছে।

অন্যদিকে, কালিয়াচকের মুসলমান ব্যবসায়ীরা হিন্দুদের জমিতে টাকার বিনিময়ে পোস্ত চাষ করাচ্ছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, আবগারি দপ্তর এইরকম গরিব হিন্দু চাষিদের বেআইনি পোস্ত চাষ করায় কেস দিয়েছে এবং আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে। পোস্ত চাষের সঙ্গে জালনোট এবং জঙ্গি কার্যকলাপেরও যোগ আছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে। বি এস এফ কিছুটা সক্রিয় হওয়াতে সীমান্তে এখন জালনোট কিছুটা বন্ধ হয়েছে। তবে কালিয়াচক এবং সুজাপুরে জঙ্গিদের একটি বড় ঘাঁটি রয়েছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন গোয়েন্দা আধিকারিকরা।

সূত্রে প্রকাশ, রাজ্য সি আই ডি দপ্তর এই সব জঙ্গিদের যে কোনো কারণেই হোক আড়াল করার চেষ্টা করছে। কিন্তু কেন্দ্র সরকার এন আই এ বা সেন্ট্রালের গোয়েন্দা দপ্তর দিয়ে তল্লাশি চালালে দেশবিরোধী গতিবিধির হদিস পাওয়া যাবে বলে ওয়াকিবহাল সূত্রে জানা গেছে।

কলকাতায় বাংলাদেশি টুরিস্টের সংখ্যাবৃদ্ধিতে উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ফেব্রুয়ারি থেকে জুন গত পাঁচ মাসে কলকাতায় বাংলাদেশি টুরিস্টের সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এই মর্মে রাজ্য সরকারকে বাংলাদেশ-পাকিস্তান-আফগানিস্তান থেকে আসা প্রত্যেকের ওপর কড়া নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে গত বছরের তুলনায় এ বছর এক লক্ষ অতিরিক্ত টুরিস্ট বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পশ্চিমবঙ্গ এবং সমগ্র ভারতের পক্ষে যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন মন্ত্রকের আধিকারিকেরা।

রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারে রাজ্য এবং কলকাতা পুলিশকে ওই তিন দেশ থেকে আসা প্রত্যেক টুরিস্ট সম্বন্ধে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করার নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ফেব্রুয়ারি থেকে জুন— এই পাঁচ মাসে বাংলাদেশ থেকে মোট ৫,৫২,৫১৯ জন ভারতে এসেছেন। অথচ গত বছর এই সময়ে সংখ্যাটা ছিল ৪,৫৭,৪৬৭ জন। প্রত্যেক বছর বাংলাদেশি টুরিস্টের সংখ্যায় ৩.৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি হয়। কিন্তু এবার বৃদ্ধি ১৮ শতাংশ! ওই আধিকারিক বলেছেন, 'এবার সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। ইউরোপ আর আমেরিকার টুরিস্টরা কলকাতায় আসেন ফেব্রুয়ারি থেকে মে-র মধ্যে। আর বাংলাদেশিদের আসার সময় সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর। এবার যেন কোনো কিছুই মিলছে না।' টুরিস্টের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'এর অনেক কারণ থাকতে পারে। তবে আমরা পুলিশকে টুরিস্টদের ওপর কড়া নজর রাখতে বলেছি।' প্রত্যেক হোটেলে টুরিস্টদের ছবি তুলে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ওই আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে যারা বাসে করে কলকাতায় আসেন তাদের মধ্যে ২১ শতাংশ যাত্রী ঢাকা-হরিদাসপুর-কলকাতা রুটটি ব্যবহার করেন। উত্তর চব্বিশ পরগনার হরিদাসপুর সব থেকে জনপ্রিয় ক্রসওভার পয়েন্ট। এতটাই জনপ্রিয় যে অন্যান্য রুটগুলি (এর মধ্যে রয়েছে বিমান পরিবহণের রুটও) ক্রমশ তাদের ব্যবসা হারাচ্ছে। ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লী বিমানবন্দরে বাংলাদেশি যাত্রী ছিল ৩৩ শতাংশ। মে মাসে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৬ শতাংশে। হরিদাসপুরের এই জনপ্রিয়তাও আপাতত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের র‍্যাডারের নীচে।

চারধাম যাত্রাপথের উন্নয়নে বাড়তি দু' হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত চারধাম যাত্রীদের পথযাত্রা আরও সুগম করতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক চলতি বছরের জন্য বাড়তি ২১০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করল। এই বাড়তি সাহায্যের ফলে সমস্ত আবহাওয়ার পক্ষে নিরাপদ ব্যবস্থা এবং কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনেত্রী—এই চার ধামের সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তা আরও চওড়া করা সম্ভব হবে। রাস্তার প্রস্থ বাড়ালে গাড়ি চালানোও অনেক বেশি ঝুঁকিহীন হবে। প্রসঙ্গত নীতীন গড়করির অধীন হাইওয়ে মন্ত্রক রাস্তার মাঝখানে সংঘর্ষ এড়াতে ধাতব ধাক্কা নিরোধক যন্ত্র লাগানো ছাড়াও হাইস্পিড করিডরগুলির দু' পাশেই প্রয়োজনীয় বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিচ্ছে।

এছাড়াও অত্যন্ত ভাল গুণমানের সাদা রঙ দিয়ে চিহ্নিতকরণের কাজ করা হবে যাতে চালকদের পক্ষে রাত্রিকালীন যাত্রাও সুগম করা যায়। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী গড়করী বলেন, দুর্ঘটনার সংখ্যা ন্যূনতম করতে দেশের সমস্ত হাইওয়েতেই metal crash barrier স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, চারধাম যাত্রীদের তিনি শুভকামনাও জানিয়েছেন।

উবাচ

"৩০০ বছর পর পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু-সংখ্যা কী দাঁড়ায়, সেটা ভাবছি। হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে যাবে না তো? মন্দির বানাবার সাহস-টাহস থাকবে?"

তসলিমা নাসরিন

কবির সুমনের ৩০০ বছর পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে মন্দির তৈরি প্রসঙ্গে।

"ভারত পাক-প্রধানমন্ত্রীকে স্পষ্ট করেই বলতে চায় যে এমনকী এই শতাব্দীর শেষেও এই স্বপ্ন পূরণ হবে না।"

সুষমা স্বরাজ,
কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী

পাক-প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে দেখতে চাওয়া প্রসঙ্গে।

"আজকে কংগ্রেসের আদর্শবাদ কী? আপনি এক বাক্যে তা আমাকে বলতে পারেন?"

মার্গারেট আলভা,
প্রবীণ কংগ্রেস নেত্রী

তাঁর আত্মচরিত (কারেজ অ্যান্ড কমিটমেন্ট) নিয়ে কংগ্রেস মহলে সমালোচনা প্রসঙ্গে।

"ফ্রান্স ও জার্মানি থেকে আসা পর্যটকদেরও নিরাপত্তারক্ষীদের মুখোমুখি হতে হবে।"

ডোনাল্ড ট্রাম্প
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী

সন্ত্রাসে আক্রান্ত দেশগুলির সন্ত্রাসের সঙ্গে আপোশের প্রসঙ্গে।

"আহত যুবকদের জন্য কষ্ট পাচ্ছি, কিন্তু ছররা গুলিই সব থেকে কম শক্তিশালী অস্ত্র।"

কে দুর্গা প্রসাদ
ডিজি, সি আর পি এফ

কাশ্মীরে পাথর বর্ষণকারী যুবকদের উদ্দেশে নিরাপত্তা রক্ষীদের গুলি চালানো প্রসঙ্গে।

লেনিনগ্রাদে বসে বাংলার রাজনীতি, দেখুন টিকিট ছাড়াই

হে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট,

তোমার দিন ফুরিয়েছে। শুধু তোমার নয়, বাম আধিপত্যের যুগে জেলায় জেলায়, পাড়ায় পাড়ায় তৈরি হওয়া প্রাসাদোপম অমুক ভবন, তমুক ভবনের দিনও ফুরিয়েছে। এখন বাংলার সিপিএম রাজনীতি বরং অনেক বেশি লেনিনগ্রাদ নির্ভর।

এইসব ভবনগুলি বরং আপনাদের উত্তরসূরী তৃণমূল কংগ্রেসকে দানপত্র লিখে দিয়ে দিন। এখনই না করলেও অবশ্য চলবে। ঘাসফুল বাহিনী চাইলে দানপত্র লিখিয়ে নেবে। রাজনৈতিক কৌশল আর কৌশলের রাজনীতি, দু'টিই নির্ধারণ করেন নেতারা। তাঁরা মনে করেন, দলের কর্মী-সমর্থকেরা তাঁদের সিদ্ধান্তকে নিজেদের চলার পথ বলেই মেনে নেবেন। সন্দেহ নেই, সাধারণ স্তরের কর্মীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনে না-নিতে পারলেও মেনে নেন। কিন্তু পরিস্থিতির বদল অনেক ক্ষেত্রে অন্য ছবিও দেখায়। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে সিপিএমের বাংলা ব্রিগেড ঠিক করেছে না ভুল, তা নিয়ে দলের কট্টরপন্থী মাথাদের একদেশদর্শী ভাবনা অবশ্য এসব রাজনৈতিক অঙ্কের অনেক ঊর্ধ্বে। অনেক ঊর্ধ্বে বাংলা ব্রিগেডের ভাবনাও। কোনো তরফের ভাবনাতেই সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের কথা ভাবা হচ্ছে না। জোটপন্থীরাও জোট করার আগে ভেবে দেখেননি যে, নীচুতলার কর্মীরা তা কতটা মেনে নেবেন। জোটবিরোধী শিবিরও ভাবছে না যে, নীচুতলা জোটকে হজম করে থাকলে জোটবিরোধী নিদান বুমেরাং হতে পারে। এই গোটা বিষয়টি একটি সঙ্কেতই দেয়। সিপিএম ভিতর থেকে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে। বঙ্গ-সিপিএমকে 'শুদ্ধ' করতে এসে প্রকাশ কারাটেরা যে বিরোধিতার মুখে পড়লেন, সার্বিকভাবে তা ওই সঙ্কেতকেই মান্যতা দেয়। 'রেজিমেন্টেড' দলে পিরামিড-কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ। সে গুরুত্ব 'ননরেজিমেন্টেড' দলে আরও বেশি।

কিন্তু বামপন্থী দলগুলির কাঠামোয় বাড়তি যে বস্তুটি ছিল, তা হলো, সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্ব। ওই পথেই তাদের রাজনৈতিক ভিত্তি মজবুত হয়েছিল। কংগ্রেস হাইকম্যান্ড-নির্ভর এবং পরিবারতান্ত্রিক। বামেরা স্তরীভূত প্রতিনিধিত্বে বিশ্বাসী। এই ফারাকের কারণেই শিক্ষিত, শ্রমজীবী মানুষের একটি বড় অংশ বামপন্থায় বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু ক্ষমতার ধারাজল বামেদের সেই রাজনৈতিক কাঠামোকে আর্দ্র করেছে। ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে, আলিমুদ্দিন বা পলিটব্যুরোর শীর্ষচূড়াই শেষ কথা। এই শেষ কথা যে আদতে পায়ের তলার মাটিকে উত্তরোত্তর শিথিল করে তুলেছে, শীর্ষনেতৃত্ব তা বুঝেও বোঝেননি। ধরাশায়ী হয়েছে বামেরা। বাংলার বামেদের অবস্থা ঠিক কী, তা পাড়ায় পাড়ায় একদা পরাক্রমশালী দলীয় কার্যালয়গুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। একের পর এক পার্টি অফিস বন্ধ হয়েছে। নীচুতলার কর্মী-সমর্থকেরা শিবির বদলেছেন। থাকার মধ্যে থেকে গিয়েছেন শীর্ষনেতারা। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারছেন না যে, তাঁরা নিঃসঙ্গ। সাইনবোর্ড হওয়ার হাত থেকে বাঁচতে বাংলায় তাই জোটের ভাবনায় গিয়েছিলেন রাজ্য নেতারা। আত্মরক্ষার একই তাগিদ ছিল কংগ্রেসেরও। কিন্তু প্রকাশ কারাটের মতো মাথারা সে জোটের ভাবনায় সায় দেননি। অর্থাৎ মরণাপন্ন দলটি নাভিশ্বাস ওঠার মধ্যেও ভিতর থেকে দ্বিধাবিভক্ত।

দু'ভাগেরই নাভিশ্বাস-পর্ব চলছে। কিন্তু কোনো পক্ষই আদতে নিজেকে অতিক্রম করতে পারছে না। জোটপন্থীদের মরিয়া ভাবের তবু ব্যাখ্যা মেলে। দেওয়ালে ঠেকে যাওয়া পিঠ আস্তে আস্তে দেওয়াল থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা। কিন্তু কট্টরপন্থী শিবিরের যুক্তি নিতান্তই অর্বাচীন। ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্তের পক্ষে কথা বলা হয়েছিল প্লেনামে। সে পরিস্থিতি এখনও বাংলায় আসেনি বলেই সম্ভবত মনে করছেন কারাট। গোটা বিষয়টি বিগ্রহ চুরি যাওয়া মন্দিরে নিত্য উপাসনার মতো। নিয়মতান্ত্রিকতারও কিছু নিয়ম থাকে। সিপিএমের কট্টরপন্থীদের তা-ও নেই। সন্দেহ নেই, এভাবে চললে সিপিএমকে আরও দুর্দিন দেখতে হবে। লেনিনগ্রাদে বসে বাংলার রাজনীতি করা যায় না।

—সুন্দর মৌলিক

মমতা যত বেশি মুসলমান তোষণ করবেন তত বেশি হিন্দু-ভোটদাতাদের সমর্থন হারাবেন

গত ২১ জুলাই কলকাতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাৎসরিক মোচ্ছবে এবার হাটে হাঁড়ি ভেঙেছেন টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বরকতি সাহেব। আদ্যন্ত কমিউন্যাল এই মুসলমান ধর্মীয় নেতা ধর্ম চর্চার থেকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চর্চাটা বেশি করেন। ধর্মতলায় ২১ জুলাইয়ের সভায় তিনি বুক বাজিয়ে বলেছেন, ‘‘বরকতি লিডার বনানা জানতা হ্যায়। যখন দরকার পড়ে বড় বড় লিডাররা আমার পা ধরে নেয়। আমি কাউকে ভয় পাই না।’’ বরকতি যখন এসব বলছেন তখন মঞ্চে থমথমে মুখে বসেছিলেন মমতা। মমতার অস্বস্তির যথেষ্ট কারণ আছে। সেই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনের সময় থেকেই মমতা রাজ্যের মুসলমান নেতাদের পা ধরেছেন। নকশালরাও ছিল তাঁর বন্ধু। মাওবাদী নেতা কিষেণজী ছিল জঙ্গলমহলে মমতার প্রাণের দোস্ত। নকশাল আর মুসলমানদের কাঁধে ভর করে নেত্রী ক্ষমতায় আসার পরেই কিষেণজী এবং তার দলবলকে এনকাউন্টার করে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে। জঙ্গলমহলকে মাওবাদী মুক্ত করার পরেই নেত্রী ঘোষণা করেন, ‘জঙ্গলমহল হাসছে’।

মমতার নীতিই হচ্ছে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দাও। অন্যদিকে, যতক্ষণ প্রয়োজন থাকবে ততক্ষণ তোষামোদ করো। মমতার এখন রাজ্যের প্রায় ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোটের প্রয়োজন। তাই বরকতি বলেছেন এখানের বড় বড় লিডাররা তাঁর পা ধরে থাকে। এখানে তিনি মুখে না বলেও ইশারা করেছেন মঞ্চে বসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বরকতির ইশারা সঠিক। ২০১১ এবং ২০১৬ সালে তৃণমূলের বিপুল জয়ের

গূঢ় পুরুষের কলম

নেপথ্যে আছে একচেটিয়া মুসলমান ভোট। এই মুসলমান ভোট একদা আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে মুলায়ম সিং যাদব ও লালুপ্রসাদ যাদবদের ভোটে জিতিয়েছিল। এবার পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি ইস্যু হয়নি। তার কারণ মুসলমানরা কোনোদিনই ক্ষমতার অপব্যবহার বা আর্থিক দুর্নীতিকে গুরুত্ব দেয় না। বরং দুর্নীতিতে আকণ্ঠ ডুবে থাকা নেতাদেরই ভোট দেয়। মুলায়ম এবং লালু তার জ্বলন্ত উদাহরণ। পশ্চিমবঙ্গে সারদা, নারদা, উড়ালপুল ভেঙে পড়ার দুর্নীতিকে রাজ্যের মুসলমান সমাজ পাত্তাই দেয়নি। আমাদের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান-সহ বিশ্বের সমস্ত মুসলমান শাসিত দেশেই দুর্নীতির রমরমা। এমনটা কেন সে কথা অভিজ্ঞ বিশ্লেষকরাই বলতে পারবেন।

মমতার একচেটিয়া মুসলমান ভোট চাই। কারণ, তাঁর লক্ষ্য, ফেডারেল ফ্রন্ট তৈরি করে দিল্লীতে ক্ষমতা দখল করা। এর জন্য প্রথমে তাঁকে জিততে হবে রাজ্যের ৪২টি সংসদীয় আসন। এই আপাত অসম্ভব স্বপ্ন সফল করতে পারে তাঁর উগ্র মুসলমান ভোটবাঙ্ক। রাজ্যের মুসলমানরা বুঝেছেন যে সিপিএম এবং কংগ্রেসের দিন শেষ। তাদের উপর আর ভরসা রাখা যায় না। বিজেপি এই রাজ্যে মুসলমানদের প্রথম পছন্দের দল নয়। সেক্ষেত্রে একমাত্র মমতা এবং তাঁর তৃণমূল দলই এখন রাজ্যের মুসলমানদের প্রধান ভরসা। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গে চিরকালই মুসলমানরা ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে দোস্তি করে চলেছে এবং এখনও চলে। কলকাতায় ২১ জুলাইয়ের সভায় নেত্রী বিজেপিকেই নিশানা করেছেন। কংগ্রেস বা সিপিএমকে নয়। এর কারণ, বিজেপিকে নিশানা করলে মুসলমান ভোটদাতাদের আস্থা সহজেই অর্জন করা যায়। তবে এর বিপদও আছে। নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুসারে মমতা যতবেশি মুসলমান তোষণ করবেন ঠিক ততটাই হিন্দু ভোটদাতাদের সমর্থন তিনি হারাবেন। এটাই বৈজ্ঞানিক সত্য। ২১ জুলাইয়ের সভা থেকে বার্তা দেওয়ার পর মমতা এখন হিল্লি-দিল্লী ছুটোছুটি করে ফেডারেল ফ্রন্ট গড়তে ঘন ঘন মিটিং করছেন। তিনি বিজেপিকে কেন্দ্রে ক্ষমতা থেকে হঠাতে উঠে পড়ে লাগলেও শুধুই মুসলমান ভোট কেন্দ্রে ক্ষমতার পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট নয়। লালু-মুলায়মদের উপর ভরসা করে লাভ নেই। তাঁরা নিজেদের রাজ্যেই জনপ্রিয় নেতা নন। মুসলমান তোষণ পশ্চিমবঙ্গে মমতাকে কিছু বাড়তি আসন এনে দিতে পারে। কিন্তু জাতীয় রাজনীতিতে এই তোষণনীতি অচল। তাই বিজেপিকে হঠাতে ফেডারেল ফ্রন্ট বাস্তবে কোনো প্রভাব ফেলবে না। ■

ইসলামি সন্ত্রাসের থাবায় বিপন্ন মানবতা

ইসলাম মানে শান্তি : এই ধারণাটাই পাল্টে দিচ্ছে আইসিস

সাধন কুমার পাল

ঢাকার গুলশনে ১ জুলাই, ফ্রান্সের নিস হত্যাকাণ্ড ১ জুলাই এবং ২০ জুলাই জার্মানির লোকাল ট্রেনে হামলার পর এটা বলা যেতে পারে সমস্ত পৃথিবীই যেন এখন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে যে-কোনো সময় যে কেউ প্রাণঘাতী হামলার শিকার হতে পারেন। আগে থেকে সাবধান হওয়ারও উপায় নেই। কারণ হামলা না চালানো পর্যন্ত ঘাতকদের আলাদা করে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। আর দশটা সাধারণ মানুষের মতো শিক্ষিত, সজ্জন, সাতে পাঁচে না থাকা ভাবমূর্তি নিয়ে সবার মাঝেই ঘাতকরা বসবাস করছে। যেমন, ফ্রান্সের নিস হত্যাকাণ্ডের জল্লাদ তিন সন্তানের পিতা মহম্মদ লাউইজ বুলেল নিস শহরেরই বাসিন্দা। তার প্রতিবেশীরা বলছে এই মানুষ যে এমন একটা নৃশংস কাণ্ড ঘটাতে পারে তা কল্পনারও অতীত। ১ জুলাই গুলশানে হামলাকারী এবং অভিযানে নিহত পাঁচ জঙ্গির পরিবারের দাবি, তাদের ছেলে পাঁচ-ছয় মাস ধরে নিরুদ্দেশ ছিল। এই পাঁচ জঙ্গিরই একজন রোহান ইমতিয়াজের পড়াশোনা ঢাকার অভিজাত স্কুল স্কলাসটিকাতে। অঙ্কে ভালো, ক্লাসে টপার। ওর মা ছিলেন ওই স্কুলেরই অঙ্কের শিক্ষিকা। নিহত ওই জঙ্গির পিতা ইমতিয়াজ খান বাবুল ঢাকা মহানগর আওয়ামি লীগের প্রাক্তন যুব ক্রীড়া সম্পাদক, বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এবং বাংলাদেশ সাইক্লিস্ট ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি।

হামলার পর ইমতিয়াজ খানের বক্তব্য, 'আই এসের প্রকাশিত ছবিতে রোহানকে দেখে আমি স্তম্ভিত! সেখান থেকেই ছেলেকে চিহ্নিত করতে পারি।' গত ৩০ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল রোহান। তারপর থেকেই সে নিখোঁজ। এতদিন সে কী করছিল তা নিয়ে এখনও অন্ধকারে পুরো পরিবার। বললেন, 'আমরা সব জায়গাতেই রোহানের খোঁজ চালিয়েছি। শেষমেষ গত ২ জানুয়ারি পুলিশকে খবর দিই। রোহানের মোবাইল সুইচড অফ ছিল।' আই এসের প্রকাশিত ছবিতে বন্দুক হাতে রোহানের ছবি দেখে বিস্মিত ইমতিয়াজের প্রশ্ন, 'কোথা থেকে বন্দুক চালানোর ট্রেনিং পেল সে? যে ছেলে একটা তেলাপোকা মারারও সাহস পেতো না। গত ছয় মাসই বা কোথায় ছিল রোহান? তাকে কোনো দিন কোনো জেহাদি বইও পড়তে দেখিনি। সে যে সন্ত্রাসবাদী হয়ে উঠছে তা কখনোই টের পাইনি।'

ফ্রান্স ও ঢাকায় নিহত সন্ত্রাসবাদীদের প্রতিবেশী ও পরিবারের লোকেদের বক্তব্য সত্য হলে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্যই এক আতঙ্ক ভরা ভবিষ্যতের সূচনা হলো। কারণ ওই সন্ত্রাসবাদীদের প্রতিবেশী ও পরিবারের লোকেদের মতো আমাদের পক্ষেও বুঝে উঠা সম্ভব নয় আমাদের প্রতিবেশীরা কখন মহম্মদ লাউইজ বুলেল কিংবা রোহান অথবা জার্মানির ট্রেনে হামলাকারী কিশোর রিয়াজ খানের মতো জল্লাদ হয়ে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে?

এই ধরনের হামলা হলে অনেক 'দায়িত্বশীল' মানুষকে বলতে শোনা যায় জঙ্গিদের কোনো ধর্ম নেই। যেমন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বলেছেন জঙ্গিদের কোনো ধর্ম নেই দেশ নেই সীমানা নেই, জঙ্গিরা শুধুই জঙ্গি। শুধু মমতা ব্যানার্জী নয়, বিশ্বজুড়ে ইসলামের নামে ইসলামিক গোষ্ঠীগুলির দ্বারা সংগঠিত নরমেধ যজ্ঞ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে অনেকেই ইসলামের নাম উচ্চারণ করতে চান না। অথচ প্রত্যেকটি জঙ্গি হামলার ক্ষেত্রেই কোনো না কোনো ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন হামলার উদ্দেশ্য ও দায় স্বীকার করে বিবৃতি দিচ্ছে। শুধু বাংলাদেশ নয় সমগ্র বিশ্ব জুড়ে চলতে থাকা ভয়ঙ্কর নরমেধ যজ্ঞ যে সমস্ত জঙ্গি সংগঠন ও ব্যক্তিসমূহের দ্বারা সংগঠিত হচ্ছে এদের প্রত্যেকের নামের (যেমন ইসলামিক স্টেট, জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ) সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইসলামিক পরিচয়। এর পরেও বলা হচ্ছে জঙ্গিদের কোনো ধর্ম নেই।

ভারতে তো আরো অদ্ভুত ব্যাপার। ভারতের মাটি যখন বিশ্ব জুড়ে ধারাবাহিক ভাবে ঘটে চলা ইসলামিক সন্ত্রাসের গন্তব্য হয়ে ওঠে তখন এদেশের ধর্মনিরপেক্ষ বলে পরিচিত এক শ্রেণীর মানুষ ২৬/১১-এর মুম্বই হামলা থেকে শুরু করে ভারতে এতদিন যত জঙ্গি হামলা হয়েছে তার সপক্ষে যুক্তি খাড়া করতে গিয়ে গুজরাট দাঙ্গা কিংবা অযোধ্যার বিতর্কিত ধাঁচা ধ্বংস, বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনগুলির সক্রিয়তা, দারিদ্র্য, বেকারি, অনুন্নয়নের মতো বিভিন্ন প্রসঙ্গ টেনে আনছে। ইয়াকুব মেমন, আফজল গুরুর মতো সন্ত্রাসবাদীদের ফাঁসির জন্য প্রশ্ন তোলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের নিরপেক্ষতা নিয়ে।

খোলা চোখে ধর্মের জন্য মারতে ও মরতে দেখে যারা চোখ বন্ধ করে বলেন জঙ্গিদের কোনো ধর্ম নেই দেশ নেই সীমানা নেই, জঙ্গিরা শুধুই জঙ্গি— আপাত দৃষ্টিতে তাদের এই ধরনের প্রতিক্রিয়ার পেছনে তিনটি সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে। (১) ওঁরা অর্বাচীন, (২) ওঁরা অতি সাবধানি ও

দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন অথবা, (৩) ভয়ঙ্কর মতলববাজ। একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে ইসলামিক জঙ্গিদের ধর্ম নেই বলে যাঁরা প্রতিক্রিয়া দেন তাঁরা অর্বাচীন তো ননই, আবার সাবধানি ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্নও নন। কারণ দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন কেউ আমজনতাকে অর্বাচীন ভেবে তাদের সামনে সত্যকে আড়াল করে পরোক্ষে সন্ত্রাসবাদীদের বাড়তে দেওয়ার চক্রান্তে শামিল হতে পারেন না।

নানা কারণে মূল স্রোতের মিডিয়া নীরব থাকলেও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় এই সমস্ত দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা যাচ্ছে। এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, হিটলার লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করেছিল সেই ক্ষোভ থেকে একজন ইহুদি সন্ত্রাসবাদী হয়েছে শোনা যায়নি। কাশ্মীরি পণ্ডিত, বাংলাদেশ-পাকিস্তানের হিন্দুরা বর্বরতার সীমা ছাড়িয়ে অত্যাচারিত হয়ে ভিটেচ্যুত হলেও বদলা নেওয়ার জন্য এদের মধ্যে কোনো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের জন্ম হয়নি। পরমাণুবোমা ফেলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার পর আমেরিকাকে ধ্বংস করার জন্য কোনো জাপানি সন্ত্রাসবাদী হয়ে উঠেনি। তাহলে শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই হাড় হিম করা সমস্ত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের জন্ম হয় কেন?

আজ এই সত্যকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, মুসলমান মাত্রেই সন্ত্রাসবাদী না হলেও মুসলমানদেরই একটি অংশ এক হাতে তরবারি আরেক হাতে কোরান নিয়ে তারা সমগ্র বিশ্বকে ইসলামের ছাতার তলায় নিয়ে খেলাফত প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেমেছে। এই ঘাতকদের নিশানা থেকে রেহাই পাচ্ছে না শান্তিপ্রিয় মুসলমানরাও। ইরাক সিরিয়া আফগানিস্তান পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদী হানায় যারা মরছে বা ধরে এনে যাদের জবাই করা হচ্ছে তারা সবাই মুসলমান। নামাজের সময় বা কোনো উৎসবের সময় বোমা নিক্ষেপ করা হচ্ছে শিয়া, আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের মতো সমস্ত অসুন্নি মুসলমান সম্প্রদায়ের মসজিদে। যে মুসলমানরা বলে ইসলাম মানে শান্তি সেই মুসলমানরাও তাদের কাছে কাফের তুল্য শত্রু— বধ্য। সেজন্য, পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে হবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে এই বর্বরতার বিরুদ্ধে।

এখনো পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষ ব্র্যান্ডের কোনো নেতানেত্রী হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে আমজনতাকে ইসলামিক জেহাদিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ডাক দেননি। বরং এই সমস্ত নরহত্যার ঘটনা থেকে ইসলামকে আড়াল করার দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার অজুহাতে আমজনতাকে উট পাখির মতো বালিতে মুখ গুজে আসন্ন বিপদ থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন। দায়িত্বশীল বলে পরিচিত এই ধরনের মতলববাজ মানুষের আচরণের সবচেয়ে যুক্তি সম্পন্ন ব্যাখ্যা বোধ হয় এটিই যে এরা সমস্ত মুসলমানদেরই সন্ত্রাসবাদী কিংবা সন্ত্রাসবাদের সমর্থক ভাবেন। সেজন্য কানাকে কানা বা খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না নীতিবাক্য ধরে এরাও মুসলমানদের মনে ব্যথা দিতে চান না। রাজনীতিক হলে মুসলমান ভোট হারানোর ভয়, আঁতেল বুদ্ধিজীবী হলে ধর্মনিরপেক্ষ তকমা হারানোর ভয়েই হয়তো এক শ্রেণীর মানুষ সন্ত্রাসের কোনো ধর্ম হয় না বলে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জঙ্গিদের ধর্ম পরিচয় আড়াল করার প্রয়াস করেন।

তবে পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোরালো হচ্ছে। তাছাড়া সত্যও খুব বেশি দিন চেপে রাখা যায় না। যেমন, জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার প্রতিক্রিয়ায় বলেই ফেলেছেন, 'ইসলামের নামে রক্তপাত লজ্জাজনক'। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গুলশন হামলার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেছেন, '...রমজান মাসে একজন মুসলমান যাবে নামাজ পড়তে। আজান উপেক্ষা করে এরা গেল মানুষ খুন করতে। তাহলে কেমন মুসলমান তারা? কেমন ধর্ম তারা রক্ষা করে?'

এমনটাও অনেকে বলেন যে শান্তিপ্রিয় মুসলমানরা ভয়েই নিজের ধর্মের সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন না। এই বক্তব্যের সপক্ষে দু'একটি উদাহরণই যথেষ্ট। সৌদি আরবের মদিনা শহরে আত্মঘাতী বোমা হামলা হয়েছে। গত ৪ জুলাই সোমবার ইফতারের সময় পবিত্র মসজিদ নববির কাছে এ হামলা হয়। এটি ইসলামের সবচেয়ে পবিত্র স্থানগুলোর একটি। ভয়ে হোক বা ভক্তিতে এই ধরনের ঘটনা নিয়েও মুখ খুলতে দেখা যায়নি মুসলমান সমাজের মানুষকে। তবে বিশ্বজুড়ে রক্ত ঝরানোর ঘটনায় কাঠগড়ায় যেহেতু ইসলাম সেজন্য এই ধর্মের শান্তিকামী অংশকে মুখ খুলতেই হবে, প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামনের সারিতে এসে দাঁড়াতে হবে। এসব ঘটনা নিয়ে মৌন থাকলে মুসলমান সমাজের প্রতি মানুষের অবিশ্বাস বাড়বে। বিশ্বজুড়েই মুসলমান বনাম অ-মুসলমান মেরুকরণ হবে। যা কিনা শুধু মুসলমান বিশ্ব নয় সবার জন্যই এক অশনি সঙ্কেত।

ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ সমগ্র বিশ্বের সামনেই বড় হুমকি। নকশাল আন্দোলনের সময়ও সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ঘরের মেধাবী ছেলেরা সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হত্যালীলায় মেতে উঠেছিল। এখন সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত মুসলমান ঘরের ছেলেরা শামিল হচ্ছে জেহাদে। শেখ হাসিনা এদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে যা বলেছেন তার মর্মার্থ হলো এমন এমন ঘরের ছেলেরা জেহাদে শামিল হচ্ছে যাদের এই জীবনে সব পাওয়া হয়ে গেছে। এখন জেহাদের মাধ্যমে বেহেস্তের হুরি পরি পাওয়ার জন্য মানবতাকে হত্যা করছে। হিটলারের মতো সভ্যতা বিপন্নকারী মানবতার শত্রুদের বিশ্বজয়ের স্বপ্নও সফল হয়নি। ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের বিশ্বজুড়ে খেলাফত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল হবে না। তবে এবারের বিপদটা বোধহয় হিটলারের চেয়েও বড়। কারণ এখানে শত্রু নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত নয়।

অভিযোগ উঠছে, ইসলামি ধর্মগ্রন্থের বিশেষ কিছু নির্দেশিকা রক্তবীজের রক্তের মতো নতুন নতুন জেহাদির জন্ম দিচ্ছে। ভূমিতে রক্তের পতন বন্ধ করে রক্তবীজের জন্ম রুখে দিয়ে নির্মূল করা হয়েছিল। ঠিক তেমনি যাঁরা বিশ্বাস করেন ইসলাম মানে শান্তি তাঁদের পথ খুঁজে বের করতে হবে যাতে ইসলামের প্রেরণায় জেহাদি জল্লাদের জন্ম না হয়। বিপন্ন মানবসভ্যতাকে বাঁচাতে সমগ্র বিশ্বকে সীমানা ভুলে গিয়ে একজোট হয়ে শূন্য সহনশীলতা সম্পন্ন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আচমকা যেখানে সেখানে যে কোনো অস্ত্র নিয়ে সন্ত্রাসবাদীরা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাতে শুধুমাত্র সশস্ত্র বাহিনী নয়, আম জনতাকেও প্রশিক্ষণ দিয়ে, সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য তৈরি করতে হবে। ■

ভারতের বহিরাগত আত্মীয়

সন্দীপ চক্রবর্তী

বিভিন্ন সময়ে ভারতে যারা এসেছে তাদের বেশিরভাগই আর ফিরে যায়নি। এখানেই বসতি স্থাপন করে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে থেকে গেছে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে তারা সকলেই ভারতীয় জাতিসত্তার অঙ্গ হয়ে উঠতে পেরেছে। উদাহরণস্বরূপ, মুসলমানদের কথা বলা যেতে পারে। তারা বড়জোর ভারতের নাগরিক, জাতে ভারতীয় নয়। ভারত এখনও তাদের কাছে না-পাক (অপবিত্র), হিন্দুরা কাফের (বিধর্মী)। যেহেতু ধর্মেই নিহিত

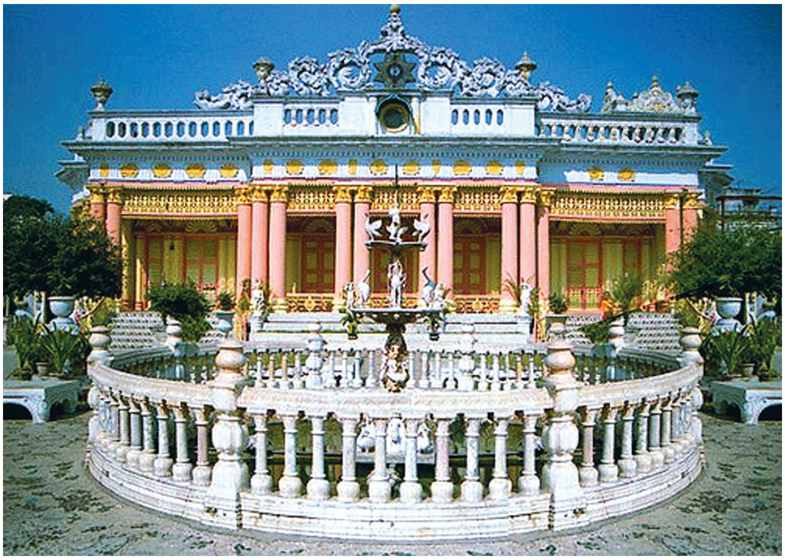

কলকাতায় একমাত্র পারসি মন্দির।

থাকে তাদের পরিচয় তাই ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের একটা বেশ বড়ো অংশ মনে মনে ইসলামি দেশগুলির সঙ্গে অধিকতর একাত্মতা অনুভব করেন। ক্রিকেট খেলায় পাকিস্তান ভারতকে হারালে মুসলমান মহল্লায় আতসবাজি পোড়ে, উৎসব হয়। এটা দেশদ্রোহিতা কিনা সে প্রশ্ন এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু কথাটা তুলতে হলো কারণ মুসলমানদের না চিনলে পারসিদের ঠিকমতো চেনা যাবে না। পারসিরাও এদেশে বহিরাগত। নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষায় মুসলমানদের মতোই অবিচল। তার থেকেও বড়ো কথা, সংখ্যার বিচারে মুসলমানদের থেকে ঢের বেশি সংখ্যালঘু। কিন্তু মনেপ্রাণে খাঁটি ভারতীয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভারতের সুখদুঃখের দোসর।

কথাটার একটু বিস্তার প্রয়োজন। সারা পৃথিবী যখন শরণার্থী সমস্যায় জেরবার, তখন ভারত শরণার্থী হয়ে আসা একটি সম্প্রদায়কে নিয়ে গর্বিত। তার কারণ পারসিরা যেভাবে এই দেশকে আপন করে নিয়েছে আর যেভাবে বিত্তে-বৈভবে, জ্ঞানে-গরিমায় দেশকে সমৃদ্ধ করে চলেছে তাতে তাদের শরণার্থী মনে করে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এমনকী তাদের শুধু ভারতের নাগরিক বললেও মনের সায় মেলে না। হিন্দুদের মতো তারাও ভারতমাতার সন্তান। সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের দিন থেকে পারসিরা সারা ভারতবর্ষকে একতার শিক্ষা দিয়ে চলেছে। ভারত যে আন্তর্জাতিক স্তরে আরও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে পারে সেই বিশ্বাসের অনেকখানি পারসিদের দেওয়া। অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা যে সব বিষয়ে গরম-গরম বক্তৃতা দেন পারসিরা নিঃশব্দে সেগুলি তাদের দৈনন্দিন জীবনে পালন করে চলেন। ফেসবুক-টুইটারে কোনো পোস্ট ছাড়াই একটি সম্প্রদায় তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি বাঁচিয়ে রেখেছে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

আর একটি আশ্চর্যের ব্যাপার, পারসিদের আত্মসম্মানবোধ। সারা পৃথিবীতে কেউ বোধহয় কোনোদিন কোনো পারসিকে ভিক্ষে করতে দেখেনি। এই সেদিনও চারপাশের বিবর্ণ দারিদ্র্যের মাঝখানে পারসি কলোনিগুলো ঝলমল করত। যদিও তার জন্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে পারসিদের ব্যবহারে আন্তরিকতার কোনো অভাব হয়নি। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃস্টান সকলের কাছেই পারসিরা জনপ্রিয়। একটি সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত ধনী হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের প্রিয় হয় সেটা একটা রহস্য। কিংবা কীভাবে একটি সম্প্রদায় সার্বিকভাবে আর তার প্রতিটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে একসঙ্গে সফল ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে? অথবা, জনসংখ্যার বিচারে পারসিরা প্রায় নগণ্য (সারা পৃথিবীতে এক লক্ষ) হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে তারা জীবনের সর্বত্র উৎকর্ষের এমন গভীর ছাপ রেখে যেতে পারে? এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে পারসিদের ইতিহাস জানা প্রয়োজন। পারসিরা এ বছর তাদের পূর্বপুরুষের জন্মভূমি পারস্য (অধুনা ইরান) থেকে ভারতে চলে আসার হাজার বছর পূর্তির উৎসব পালন করছে। সুতরাং পারসিদের ইতিহাসের অলিগলিতে প্রবেশ করার এটাই সেরা সময়।

সোনার জন্মভূমি ছেড়ে নিরাপদ আবাসভূমির খোঁজে যাত্রা

প্রোফেট অশো জরাথুস্ত্র ধর্মমত অনুযায়ী পারসিরা জরথুস্ত্রবাদী। জরথুস্ত্রবাদের জন্ম পারস্যে। সেইজন্যেই এই ধর্মমতে বিশ্বাসীরা পারসি নামে পরিচিত।

এরা অগ্নির উপাসক। নানা জায়গায় অগ্নি মন্দিরও রয়েছে। এই মন্দিরে পারসিদের দেবতা আহুর মাজদা পূজিত হন। আহুর মাজদা শব্দটির অর্থ জ্ঞানের দেবতা। পারসিদের ইতিহাসে সাল-তারিখের সমস্যা প্রবল। বলা হয়, আনুমানিক ৩০০০ খৃস্টপূর্বাব্দে অশো জরথুস্ট্র তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। এই ধর্ম সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছয় অ্যাকেমেন সাম্রাজ্যের মহান সম্রাট সাইরাস এবং দারিউসের আমলে। যদিও দু'জনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ সেই বিষয়ে ইতিহাসের সাক্ষ্য : সম্রাট সাইরাস ছিলেন প্রাচীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং বিশ্বের প্রথম সাম্রাজ্যের সফল স্থপতি। বিপুল সামরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন খুবই সহনশীল প্রকৃতির মানুষ। ধর্মপালনের স্বাধীনতা ছাড়াও তিনি বিশ্বাস করতেন বাক্‌স্বাধীনতায়। বিশ্বে তিনিই প্রথম মানবাধিকারের কথা ভেবেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল প্রতিটি মানুষের নিজের ইচ্ছে ও রুচি অনুযায়ী ধর্মপালনের অধিকার থাকা উচিত। তবে ধর্মপ্রচারের অনুমতি তিনি দেননি। এর ফলে তার আমলে ধর্ম হয়ে উঠেছিল মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। সর্বসমক্ষে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান একরকম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। আজকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই সিদ্ধান্ত খুবই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। পারসিরা এখনও সম্রাট সাইরাসের সিদ্ধান্ত অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। অন্যান্য ধর্ম তাদের কাছে একটা বিশাল গাছের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মতো। আর ধর্মান্তরকরণ হলো শাখাগুলো কেটে গাছটাকে মেরে ফেলা। বস্তুত ধর্মীয় বহুত্ববাদের প্রতি পারসিদের অবিচল আস্থা তাদের এমন সহনশীল আর শান্তিপ্রিয় করে তুলেছে। ওই জায়গায় হিন্দুদের সঙ্গে পারসিদের আশ্চর্য মিল।

যাই হোক, গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডারের সঙ্গে যুদ্ধে পারসিরা প্রথম বর্বরোচিত আক্রমণের মুখোমুখি হলো। বর্বরোচিত কারণ যুদ্ধটা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ক্রমশ নেমে এসেছিল পারসিদের ধর্মের ওপর। জরথুস্ট্রবাদীদের প্রায় সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্র ধ্বংস করা হয়। নির্বিচারে ভাঙা হয় অগ্নিমন্দির। সেই সঙ্গে ভেঙে পড়ে বয়েসের ভারে নুয়ে পড়া অ্যাকেমেনীয় সাম্রাজ্য। এতকিছুর পরেও পারসিরা হারিয়ে যায়নি। সাসানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর তারা আবার উঠে দাঁড়াল। কিন্তু খৃস্টপূর্ব সপ্তম শতকে আরব থেকে আসা হানাদারেরা সাসানীয় সাম্রাজ্যকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। শুরু হলো নির্বিচারে ধর্মান্তরকরণ। ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে মৃত্যু। ধর্মের নামে অত্যাচার যখন চরমে ঠিক তখন কয়েকজন জরাথুস্ট্রবাদী তাঁদের উপাস্য অগ্নিকে সঙ্গে নিয়ে হরমাজ বন্দরে জাহাজে চড়েন। উদ্দেশ্য নিরাপদ বাসভূমির সন্ধান। ধর্ম ও সংস্কৃতির রক্ষা। জাহাজ এসে পৌঁছয় ভারতে। ইতিহাস সাক্ষী, তাঁরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে গুজরাটের সঞ্জন নগরে তাঁদের বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু বিদেশি শরণার্থীদের পক্ষে অচেনা দেশে মানিয়ে নেওয়া খুব সহজ নয়। কীভাবে সম্ভব হলো তা? এখানেও রয়েছে ইতিহাসের সাক্ষ্য। শরণার্থী দলকে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন তাঁরা এদেশে থাকবেন দুধে গুলে যাওয়া চিনির মতো। তাঁরা ভারতীয়দের আবেগ-অনুভূতিকে বিন্দুমাত্র আঘাত করবেন না। বরং চিনির মতো সমগ্র পরিবেশকে সুমিষ্ট করে তুলবেন। পারসিরা এখনও সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলেছেন। মাছ যেভাবে জলকে গ্রহণ করে গুজরাট আর গুজরাটিদের পারসিরা ঠিক সেইভাবে গ্রহণ করেছেন। সঞ্জন শহরে প্রতিষ্ঠিত পারসিদের বিশাল অগ্নিমন্দির আতশ বেহরাম তার প্রমাণ।

ভারতের জরথুস্ট্রবাদী পারসিরা

গুজরাটের রাজা যাদব রাণা এদেশে পারসিদের বসবাসের অনুমতি দেন। বস্তুত হিন্দু রাজাদের অধীন ভারত বরাবর পারসিদের প্রতি সহৃদয় থেকেছে। অনুকূল পরিবেশ পেয়ে পারসিরা ক্রমশ তাদের দুঃস্বপ্নের অতীত ভুলে স্থিতু হয়; সমৃদ্ধ হতে থাকে। যে পবিত্র অগ্নি তাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয়, ভারতে সেই অগ্নির প্রথম প্রতিষ্ঠা বেদী ও মন্দির নির্মিত হয় ৭২১ খৃস্টাব্দে। ধীরে ধীরে পারসিরা গুজরাটের বিভিন্ন গ্রাম ও শহরে ছড়িয়ে পড়ে। কৃষিকাজ, বস্ত্রবয়ন ও কাঠের কাজ হয়ে ওঠে তাদের পেশা। এর পরের তিনশো বছর পারসিদের সুখের সময়।

কিন্তু পারসিদের কপালে সুখ বেশিদিন সইল না। বস্তুত মহম্মদ ঘোরির ভারত আক্রমণ এবং পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরাজয় সমগ্র ভারতবর্ষকে এক ক্লেদাক্ত অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করল। ১৪৬৫ সালে সুলতানের আদেশে সঞ্জন শহর লুণ্ঠিত এবং ধ্বংস হয়। হিন্দু প্রতিবেশীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল পারসিরা। কয়েকজন পারসি পুরোহিত তাঁদের আরাধ্য অগ্নিকে গোপনে জঙ্গল ও সমুদ্রে ঘেরা এক পাহাড়ের গুহায় স্থানান্তরিত করতে সক্ষম হন। পূতপবিত্র অগ্নি সেই গুহায় থাকে প্রায় বারো বছর।

ভারতে পারসিরা দুধে মিলে যাওয়া চিনির মতো

হিন্দুদের সঙ্গে পারসিদের মেলবন্ধনের কথা বলতে গেলে দুধ ও চিনির উপমা দিতে হয়। দুধে মিশে যাওয়ার পর চিনি আর দেখা যায় না কিন্তু স্বাদে টের পাওয়া যায়। এদেশে এভাবেই থাকার কথা বলেছিলেন পারসিদের আদিপুরুষ। তাঁর কথার অন্যথা হয়নি। ভারতের স্থানীয় মানুষ এবং সংস্কৃতির সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে মিশে গেছেন পারসিরা। এমনকী এখানকার রীতিনীতি এবং সনাতন ঐতিহ্যগুলিকেও আপন করে নিয়েছেন তাঁরা। পারসি মহিলারা ভারতীয় পোশাকে সচ্ছন্দ হয়ে উঠেছেন। অলঙ্কার ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও তাঁরা নিখাদ ভারতীয়। মূল পারসি ভাষাচর্চা অক্ষুণ্ণ রাখার পাশাপাশি গুজরাটি হয়ে উঠেছে তাদের মাতৃভাষা। সব থেকে বড়ো ব্যাপার, তাদের বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ। পারসিদের উপাসনার ভাষা আবেস্তাঁ ও সংস্কৃত একই ভাষাশ্রেণীভুক্ত। জরথুস্ট্রবাদ এবং ঋগ্বৈদিক হিন্দুধর্মের মধ্যে এমন অজস্র মিল রয়েছে যার জন্য পরস্পরকে 'সহোদর সংস্কৃতি' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। দুটি ধর্মের কাছেই অগ্নি পবিত্রতার প্রতীক। হিন্দুরা যাকে বলছে 'অগ্নি', পারসিরা তাকেই বলছে 'আতশ'। কিন্তু বিশ্বাসটা একই। মানুষের মনের মধ্যে রাত্রিদিন ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব চলছে। পবিত্র অগ্নি প্রতিটি মন ও হৃদয়কে আলোকিত করুক যাতে সবাই ভালো ও মন্দ

চিনতে পারে। হিন্দুদের গায়ত্রীমন্ত্রে এই কথাই বলা হয়েছে। তাছাড়া, হিন্দুরা যেমন প্রকৃতির পূজারি, পারসিরাও তাই। বহু প্রাচীনকাল থেকে হিন্দুরা পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রকৃতির পাঁচটি মৌলিক উপাদান (ক্ষিতি, অপ, তেজঃ মরুৎ, ব্যোম)-কে দেবত্ব আরোপ (রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়াসী হয়েছিল) করেছিল। অনুরূপভাবে পারসিরাও দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবী, জল, আগুন ও বায়ুর উপাসনা করে আসছে। পরিবেশকে দুষিত করা পারসিদের ধর্মে পাপ হিসেবে গণ্য।

হিন্দুরা যেমন জন্মমুহূর্ত থেকেই হিন্দু, পারসিরাও জন্মমুহূর্ত থেকে পারসি। এ ব্যাপারে কোনো প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন অপ্রয়োজনীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইসলাম ও খৃস্টধর্মে আনুষ্ঠানিক রীতি মেনে মসজিদ বা গির্জার অনুমোদন প্রয়োজন। হিন্দু ও পারসি ধর্ম জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারণে নিষ্ঠাবান, চরিত্রবান ও শ্রদ্ধাবান হয়ে ওঠার কথা বলে। হিন্দুদের চরমতম মূল্যবোধ হলো 'সত্য' আর ভাবগত দিক থেকে একই অর্থে পারসিদের কাছে তা 'আশা'। হিন্দুদের 'ভজন' আর পারসিদের 'গাথা' (প্রোফেট জরথুস্ত্র রচিত) ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের সাঙ্গীতিক প্রকরণ। সুতরাং মিল অনেক জায়গায়। আর এত মিল বলেই এই ভাবসম্মিলন।

নৈতিকতা না কি ধর্ম?

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারসিদের অতি মানবিক স্বাক্ষর সারা পৃথিবীকে আশ্চর্য করে দেয়। এই বিরাট সাফল্যের পিছনেও রয়েছে জরথুস্ত্র ধর্মের স্পষ্ট ইঙ্গিত। জরাথুস্ত্র তাঁর অনুগামীদের সম্পদ নির্মাণে বাধা দেননি। চেয়েছেন, প্রত্যেকে যে-যার আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে সমাজ এবং মানবতার উন্নতি সাধন করুক। তাঁর মত ও পথ আগাগোড়া যুক্তি ও বাস্তবতার তারে বাঁধা। সম্পদ নির্মাণ চলবে কিন্তু তাঁর জন্য নীতি বিসর্জন দেওয়া চলবে না। অর্থই অনর্থের মূল— এরকম কোনো যুক্তি তিনি মানেননি।

সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ যে যার সামর্থ্য, প্রতিভা এবং পরিশ্রমের জোরে কাঙ্ক্ষিত ফল ভোগ করবে, এটাই ছিল তাঁর নির্দেশ। অনুগামীদের তিনি দুটি নীতি সারাজীবন মেনে চলার কথা বলেছিলেন। এক, অন্যায় কোরো না। দুই, অতিরিক্ত সম্পদ সমাজের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করো। ফল সকলের চোখের সামনে। পারসি বলতেই ব্যবসা-বাণিজ্যে সহজাত দক্ষতা সম্পন্ন পরিশ্রমী, সৎ, প্রতিভাধর এবং সৃজনশীল সম্প্রদায়ের কথা মনে পড়ে। এতগুলি গুণের সমন্বয় তাদের একই সঙ্গে দক্ষকর্মী ও সফল উদ্যোগপতি করে তুলেছে। পারসিরা নতুন কোনো বিষয় খুব দ্রুত শিখতে পারে আবার সীমার মধ্যে থেকে ঝুঁকি নিতেও পারে। ইংরেজরা ভারতে এসে কর্মী হিসেবে পারসিদের বেছে নিয়েছিল। এমনকী পশ্চিমি শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম সুফলও পেয়েছিল পারসিরা। যে কারণে ভারতের প্রথম আমলা, ব্যারিস্টার, শল্য চিকিৎসক এবং সাংসদ--- সবাই পারসি। এখনও ভারতের বেশ কয়েকটি সেরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা পারসিদের। প্রতি বছর ধনীদের যে তালিকা প্রকাশ করা হয় সেখানেও জায়গা করে নেয় পারসিরা।

দাও বেশি নাও কম

প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি বলেছিলেন, 'দেশ তোমার জন্য কী করতে পারে ভাবার দরকার নেই। তুমি বরং ভাবো, তুমি দেশের জন্য কী করতে পারো।' এই কথাগুলির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় পারসিদের জীবনে। উদাহরণ স্যার দোরাবজী টাটা ট্রাস্ট— যারা দেশকে প্রথম ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স (বেঙ্গালুরু), প্রথম ক্যানসার হাসপাতাল, প্রথম ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেস, প্রথম ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ প্রদান করেছে। বহু ক্ষেত্রেই তারা পথপ্রদর্শক। এ ব্যাপারে জামশেদপুরে জামশেদজী টাটার ইস্পাত কারখানা নির্মাণ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ভারতের প্রথম মহিলা চিত্রসাংবাদিক হোমাই ভয়রাওয়ালাও সবিশেষ উৎকর্ষের দাবীদার।

বস্তুত জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে পারসিরা তাঁদের প্রতিভা এবং কৌলিন্যের ছাপ রাখেনি। সশস্ত্রবাহিনী থেকে শিল্পবাণিজ্য, বিজ্ঞান থেকে চিকিৎসাবিদ্যা, শিল্পকলা থেকে দর্শন— সর্বত্র। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দাদাভাই নওরোজী, ফিরোজ শাহ মেহতা এবং মাদাম ভিকাইজির নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। স্বাধীনতার আগে এবং পরে টাটাগোষ্ঠীর অবদান ভোলার নয়। বাণিজ্যক্ষেত্রে ওয়াদিয়া পেটিটস পুনাওয়ালা এবং গোদরেজ গোষ্ঠীর অবদানও কিছু কম

একটি অনুষ্ঠানে পারসি মহিলারা।

কয়েকজন প্রবাদপ্রতিম পারসি

জামশেদজী নাসেরওয়ানজী টাটা (১৮৩৯-১৯০৪)
ভারতের একজন অগ্রণী শিল্পপতি। তাঁকে বলা হোত 'ওয়ান ম্যান প্ল্যানিং কমিশন'। জামশেদপুরে ইস্পাত কারখানা নির্মাণ করে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। টাটা গ্রুপ ভারতের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানের অধিকারী।

এ.বি.এস. গোদরেজ (১৮৬৮-১৯৩৬)
বিখ্যাত ভারতীয় উদ্যোগপতি। সহোদর পিরোজশাহ বারজরজীর সঙ্গে তিনি গোদরেজ ব্রাদার্স কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। ইলেকট্রনিক এবং কসমেটিকস শিল্পে এই কোম্পানির অবদান অনস্বীকার্য।

লভজী নাসেরওয়ানজী ওয়াদিয়া (১৭০২-১৭৭৪)
বিখ্যাত জাহাজনির্মাতা ও নৌ-স্থপতি। ১৭৩৬ সালে তিনি ওয়াদিয়া গ্রুপের প্রতিষ্ঠা করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় পর্যন্ত ওয়াদিয়া গ্রুপ ছিল ভারতের বেসরকারি ক্ষেত্রে জাহাজ নির্মাণের অগ্রণী সংস্থা।

ফিল্ড মার্শাল স্যাম মানেকশ (১৯১৪-২০০৮)
ভারতীয় সেনার প্রথম ফিল্ড মারশাল। মানেকশ-র নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত জয়লাভ করেছিল।

জুবিন মেহতা (১৯৩৬)
মুখ্য পরিচয় পাশ্চাত্য সঙ্গীতের কনডাক্টর। তবে তাঁর প্রতিভা সঙ্গীতের নানা ক্ষেত্রে বিকশিত। জুবিন মেহতা ইজরায়েলের ফিলহারমনিক অর্কেস্ট্রার সঙ্গীত পরিচালক এবং ভ্যালেন্সিয়ার অপেরা হাউসের প্রধান কনডাক্টর।

হোমি জাহাঙ্গির ভাবা (১৯০৯-১৯৬৬)
ভারতের পারমাণবিক কর্মসূচির জনক। পরমাণু পদার্থবিদ্যার মেধাবী ছাত্র ও গবেষক। পরবর্তীকালে ভারতের পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান; টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ-এর প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর ও অধ্যাপক।

দাদাভাই নওরোজী (১৮২৫-১৯১৭)
তাত্ত্বিক রাজনৈতিক নেতা। এশিয়দের মধ্যে তিনি প্রথম বৃটিশ সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনিই প্রথম ইংরেজদের কাছে প্রকাশ্যে ভারতের স্বাধীনতা দাবি করেন।

ননী পালকিওয়ালা (১৯২০-২০০২)
বিখ্যাত আইনজীবী ও অর্থনীতিবিদ। প্রিন্সটন ও রুটজার্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডক্টরেট পেয়েছেন। ১৯৭৭ সালে আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন।

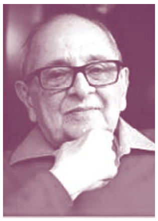

ফলি নরিম্যান (১৯২৯)
সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং সুপ্রিম কোর্টের বিখ্যাত আইনজীবী। ১৯৯১ সালে বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ এবং পদ্মবিভূষণ পুরস্কারে সম্মানিত করেছে।

পারসিদের ধর্মীয় প্রতীক 'অগ্নি'।

নয়। ভারতের পরমাণু বিজ্ঞান গবেষণার জন্ম হয়েছিল পারসি বৈজ্ঞানিক ড. হোমি জাহাঙ্গির ভাবার হাতে। ননী পালকিওয়ালা এবং ফলি নরিম্যানের মতো প্রবাদপ্রতিম সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও আইনজীবী দেশকে উপহার দিয়েছে পারসিরা। এছাড়া, শিল্পী কেকি দারুওয়ালা, সঙ্গীতস্রষ্টা জুবিন মেহতা এবং গজল গায়িকা পিনাজ মাসানির নাম আলাদা করে উল্লেখ করতে হয়। সব শেষে স্যাম মানেকশ। যাঁর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতের জয়লাভ। এটা এমন এক বিরল গৌরব যা আজও ভারতের মুকুটে উজ্জ্বলতম পালক। সাম্প্রতিককালে পারসি অভিনেতা বোমান ইরানি এবং রাজ জুৎসি স্বক্ষেত্রে যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেছেন।

পারসিদের বর্তমান অস্তিত্ব সঙ্কট

কিন্তু এই মুহূর্তে পারসিরা চরম অস্তিত্ব-সঙ্কটের মুখোমুখি। স্বাধীনতার পর থেকে তাদের সংখ্যা প্রায় ৩০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এর জন্য প্রধানত দায়ী পারসিদের জাতিগত বিশুদ্ধতার প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান। এর ফলে একই বংশের ছেলেমেয়েদের বিবাহের ফলে জিনগত সমস্যার সমাধান সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া রয়েছে নারীপুরুষের অনুর্বরতা, বংশগত অসুখ-বিসুখ এবং মানসিক বৈকল্য। এখনও পর্যন্ত পারসিসমাজে অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে বিবাহ অনুমোদন পায়নি।

একটি সরকারি সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেক দশকে পারসিদের সংখ্যা ১০ শতাংশ করে কমে যাচ্ছে। কেন্দ্রের সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রক সম্প্রতি 'জিয়ো পারসি' নামে একটি প্রকল্প শুরু করেছে। পিপিপি মডেলে গঠিত এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়াও রয়েছে বম্বে পারসি পঞ্চায়েত এবং টাটা ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেস। এই প্রকল্পের দুটি দিক— একটি আইনগত অন্যটি চিকিৎসা সংক্রান্ত। এই প্রকল্পে পারসি যুবক- যুবতীদের যেমন অসবর্ণ বিবাহে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে তেমনি বিবাহেচ্ছু যুবক-যুবতীদের জিনের গঠন এবং বংশগতির পক্ষে ক্ষতিকারক রোগব্যাধির চিকিৎসাও করা হচ্ছে। পারসিদের সংখ্যাবৃদ্ধি করার জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করেছে সরকার। এখন ভারতে প্রায় ৬০ হাজার পারসি বসবাস করেন। আর ভারতের বাইরে (পারসিদের উৎসভূমি ইরান-সহ) সারা পৃথিবীতে মাত্র ৩০ হাজার পারসি বাস করেন। ভারতের কাছে যা চরমতম শ্লাঘার বিষয়। ভারতের কর্তব্য যেভাবে হোক পারসিদের রক্ষা করে তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া। কেন্দ্রের আর একটি প্রকল্প 'হমারি ধরোহর' এই উদ্দেশ্যেই তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি দিল্লীতে জরথুস্ত্রবাদী সংস্কৃতি এবং জাতীয় জীবনে পারসিদের অবদানকে কেন্দ্র করে একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

একথা অনস্বীকার্য ভারতে যত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে তাদের মধ্যে পারসিরাই সব থেকে উজ্জ্বল। যদিও পারসিরা নিজেদের 'সংখ্যালঘু' বলে মনে করতে চায় না— এমনকী সংখ্যালঘুদের জন্য প্রদত্ত সরকারি ভাতা-অনুদান কিছুই নেয় না। এমন একটি সম্প্রদায়কে ভারত কিছুতেই হারিয়ে ফেলতে চাইবে না। সরকারের তো বটেই, দেশের মানুষও আশা করবে উপাস্য অগ্নিশিখার মতো পারসিদের জীবনশিখাও সারা পৃথিবীকে আলো দেখাক। এই মুহূর্তে পৃথিবীতে আলোর বড়ো অভাব।

কলকাতায় পারসিদের একমাত্র ধর্মশালা।

কলকাতার পারসিয়ানা

পারসিদের শহর বললে প্রথমেই মনে পড়ে বোম্বাই (অধুনা মুম্বই) শহরের কথা। কলকাতার কথা বিশেষ মনে পড়ে না। এদেশে আসার পর থেকেই বোম্বাই হয়ে উঠেছিল পারসিদের প্রধান শহর। কিন্তু একমাত্র শহর নয়। পারসিরা সারা দেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল। কলকাতাও হয়ে উঠেছিল তাদের নিজের শহর।

১৮ শ শতক থেকে পারসিরা কলকাতায় থাকতে শুরু করে। এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, কলকাতায় পা রাখা প্রথম পারসির নাম দাদাভাই বেহরামজী বানাজী। ১৭৬৭ সালে তিনি গুজরাট থেকে কলকাতায় আসেন ব্যবসা করবেন বলে।

বস্তুত বণিক ইংরেজ শাসক ইংরেজে বদলে যাবার পর থেকেই পারসিদের বাড়বাড়ন্তের শুরু। ১৬৯০ সালে জোব চার্নক স্থানীয় জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীর কাছ থেকে তিনশো টাকায় সুতানটি গোবিন্দপুর ও কলিকাতা গ্রাম তিনটি কিনে কলকাতা শহরের পত্তন করেন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌল্লা হেরে যাবার পর বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা বৃটিশের করায়ত্ত হলো। ভারতের মধ্যে প্রথম ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত পারসিদের সামনে খুলে গেল নতুন দিগন্ত। ১৮ শতকে কলকাতা হয়ে উঠেছিল একাধারে প্রধান বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখান থেকে চীনে আফিং রপ্তানি হোত আর চীন থেকে আসত চা। ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজদের প্রধান সহকারী ছিল পারসিরা। তাদের ভূমিকা ছিল কখনও মালের

জোগানদারের, কখনও অনুবাদকের আবার কখনও নিছক দালালের।

এই সময়েই একটি একটি করে কলকাতার পারসি বাণিজ্য- প্রতিষ্ঠানগুলি তৈরি হয়। এইসব প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কাজ ছিল জাহাজে মাল তোলা আর খালাস করা। কোনো কোনো সংস্থা দালালিও করত। যতদিন পর্যন্ত (১৮৩৪ খৃস্টাব্দ) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একাধিপত্য ছিল ততদিন পারসিরা দেশি বেনিয়া নামে পরিচিত ছিল। কোম্পানির আধিপত্য শেষ হবার পর এই বিপুল বাণিজ্যের পুরোটাই চলে গিয়েছিল বেনিয়াদের অর্থাৎ পারসিদের হাতে। বিখ্যাত পারসি পরিবারগুলির মধ্যে বানাজী, রেডিমনি, ওয়াদিয়া, ভারদা, কামা, পটেল, ভিকাজি এবং পারেখ— বলতে গেলে অধিকাংশই চীনের সঙ্গে বাণিজ্যে যুক্ত ছিলেন। তবে চীনা বাণিজ্যের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নাম জামশেদজী জিজিবয়। তাঁর জাহাজ কলকাতা এবং বোম্বাই দুই বন্দর থেকেই চলত। বাণিজ্যের সুবিধার্থে বহু পারসি পরিবার ক্যান্টন, ম্যাকাও, হংকং, অ্যাময়, সিঙ্গাপুর, পেনাঙ, বাটাভিয়া ইত্যাদি শহরে বসবাস করতে শুরু করে।

১৮শ শতক থেকেই কলকাতা জাহাজ নির্মাণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ১৭৩৬ সালে বোম্বাই বন্দর চালু হবার পর বৃটিশের আমন্ত্রণে ওয়াদিয়ারা এবং লভজি নাসেরওয়ানজী সেখানে জাহাজ নির্মাণ শুরু করেন। আর কলকাতায়, ১৮৩৭ সালে রুস্তমজী কওয়াসজী ছয় লক্ষ টাকায় খিদিরপুর ও সালকিয়া (তৎকালীন শালিখা) বন্দর কিনে নেন। তিনি পশ্চিম ভারতের ডি. আর. এম ওয়াদিয়ার কাছ থেকে জাহাজ কিনে কলকাতায় নিয়ে আসেন। জাহাজ নির্মাণে পারসিদের দক্ষতা সহজাত। মূলত তাদের জন্যই ভারত একসময় এশিয়ার অন্যতম প্রধান জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে পারসিরা আরও নানান ব্যবসায়িক উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং কালক্রমে তাদের অর্জিত সম্পদ নিয়ে গল্পগাথা লোকের মুখে মুখে ফিরতে শুরু করে।

পারসিরা জরথুস্ত্রবাদী। অগ্নির উপাসক। ভারতের অন্যান্য নানা শহরের মতো কলকাতাতেও তারা নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণে অনেক কাজ করেছে। ১৮২২ সালে নওরোজি সোরাবজী উমরিগর কলকাতায় একটি শান্তিমিনার নির্মাণ করান। বৃত্তাকার গড়নের মিনারটিকে ঘিরে রয়েছে কয়েকটি বেদী। আর একটি কুয়ো। পারসিদের অন্তেষ্টি প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল কুয়োটি। এর থেকে বোঝা যায় কলকাতা ছিল তাদের কাছে স্থায়ী আর স্বাভাবিক বাসভূমি। এখনও তাই আছে। যাই হোক, ১৮৩৯ সালে কলকাতার ২৬ এজরা স্ট্রিটে প্রথম অগ্নিমন্দির তৈরি হয়। উদ্যোক্তা ছিলেন আর. সি. বানাজি। এই মন্দিরের চারপাশে পারসি বসতি গড়ে ওঠে এবং রাস্তাটির নাম রাখা হয় পারসি চার্চ স্ট্রিট। ১৮৯০ সালে কলকাতার পারসি সমাজের পক্ষ থেকে ধুনজিভাই বয়রামজী মেহতা তাঁর বাড়িতে (৬৫, ক্যানিং স্ট্রিট) পবিত্র অগ্নিশিখা প্রজ্বলন করেন। ১৯১২-র অক্টোবরে কলকাতার পারসিরা ধুনজিভাই-য়ের সম্মানে ৯১, মেটকাফে স্ট্রিটে একটি অগ্নিমন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরটি এখনও কলকাতায় পারসিদের অন্যতম প্রধান উপাসনা কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হয়।

কলকাতার পারসিরা পশ্চিমি মনোভাবাপন্ন এবং প্রগতিশীল সম্প্রদায়। ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই পারসিরা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে জোর দিয়েছিল। ফলত বেশ কিছু মেয়েদের স্কুল গড়ে ওঠে। ১৮৮৩ সালের ৭ জুন কলকাতার দ্য স্টেটসম্যান লিখেছিল, 'ভারতীয়দের মধ্যে পারসি মেয়েরাই লেখাপড়ায় এগিয়ে।' সংবাদপত্র শিল্পের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল পারসিরা। ১৭৮০ সালে বেঙ্গল গেজেট প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা হয়ে উঠেছিল ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রধান কেন্দ্র। ফরদুনজী মারজবান ১৮২২ সালে বোম্বাই থেকে প্রকাশ করলেন গুজরাটি সংবাদপত্র বোম্বাই সমাচার। পিরোজ শাহ মেহতা দ্য স্টেটসম্যানের তৎকালীন সম্পাদক বি. জি. হরনিম্যানকে বোম্বাই নিয়ে গেলেন তাঁর 'বম্বে ক্রনিকল' সম্পাদনা করার জন্য।

ভারতের সিনেমাজগতও পারসিদের কাছে ঋণী। কলকাতার জে. এফ. ম্যাডানের অবদান বাংলা সিনেমা তো বটেই ভারতীয় সিনেমাও কোনোদিন ভুলতে পারবে না। পুরো নাম জামশেদজী ফ্রামজী ম্যাডান। তিনি কলকাতায় রীতিমতো থিয়েটার সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। জে. এফ. ম্যাডান ছিলেন কলকাতা থিয়েটারের সামান্য কর্মী। ১৯০২ সালে তিনি মেলায়-মেলায় তাঁবু খাটিয়ে প্রোজেক্টারের সাহায্যে ছবি দেখাতে শুরু করেন। ১৯৩০-র মাঝামাঝি সময়ে ম্যাডান কোম্পানি সারা ভারতে মোট ১২৬টি থিয়েটার হলের মালিক হয়েছিল। এইসব প্রেক্ষাগৃহে বাংলা হিন্দি ওড়িয়া ছবি প্রদর্শিত হোত।

স্বাধীনতার পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে পারসিদের অবস্থা এবং অবস্থান দুইই সমীহ উদ্রেক করে। কিন্তু এই মুহূর্তে পারসিরা চরম অস্তিত্ব সঙ্কটে ভুগছে। সারা ভারতে তাদের সংখ্যা ৭০ হাজার আর কলকাতায় মাত্র একশো। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার পারসিদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপযোগী দুটি প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছে। কাজও শুরু হয়েছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। সকলেরই আশা পারসিরা এই বিপদ কাটিয়ে উঠবে। কিন্তু দৈবাৎ যদি তা না হয় ভারত যে তার পরম বন্ধুকে হারাবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আর আলাদা করে কলকাতার কথা যদি ওঠে তা হলে বলতে হয় এ শহর তার বাঙালিয়ানার মতো পারসিয়ানাও হারাতে চায় না। সুতরাং একশোজন পারসি হাজার হোক...হাজার থেকে লক্ষ হোক। এই কামনাই করে কলকাতা। ■

চিঠিপত্র

অতি লোভে তাঁতি নষ্ট

বঙ্গীয় বামেদের আমও গেছে ছালাও গেছে। কারণ ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে সর্বসাকুল্যে তাঁদের প্রাপ্তি ৩২টি আসন (সিপিএম ২৬, ফব ২, আর এস পি ৩, সিপিআই ১)। তাও আবার কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে। এই ফলাফল কেবল বামেদেরই হতবাক করেনি, হতবাক করেছে বঙ্গবাসীকেও। কিন্তু এটাই কঠিন বাস্তব। এটাই সত্য।

সত্যি বলতে কী, এদেশের বামেরা চিরকালই সুবিধাবাদী। তাঁদের নীতি-আদর্শই হচ্ছে, ক্ষমতার স্বার্থে 'যখন যেমন তখন তেমন।' তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বলে এসেছেন, তাঁরা শোষিত, বঞ্চিত, দরিদ্র তথা সর্বহারাদের পক্ষে। আর শোষক তথা ধনিকশ্রেণী তাঁদের শত্রু। কিন্তু কালক্রমে তাঁরা ক্ষমতার দম্ভে সর্বহারাদের ভুলে নিজেরাই হয়েছেন 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' এবং ধনিক শ্রেণীকে নিয়েছেন আপন করে। তাঁরাই একদা কংগ্রেসকে বুর্জোয়া, শ্রেণীশত্রু, দুর্নীতিবাজ, সাম্রাজ্যবাদের দালাল, 'রাজীব গান্ধী চোর হ্যায়' ইত্যাদি বলেছেন।

বঙ্গীয় বামেরা এতকাল যে কংগ্রেসকে কুৎসিত ভাষায় গালাগাল করেছেন, এবারের নির্বাচনী ঢাকে কাঠি পড়তেই তাঁরা তাদের হাত ধরেছেন। কারণ তাঁরা বুঝতে পারছিলেন, একক শক্তিতে লড়ে তাঁরা ক্ষমতা দখল করতে পারবেন না। তাই ক্ষমতার লোভে সারাজীবন কুস্তি করা চিরশত্রু কংগ্রেসের সঙ্গে গড়ে তোলেন দোস্তি, ভাব-ভালোবাসা। কিন্তু বিধি তাঁদের বাম। কংগ্রেস তাঁদের ঘাড়ে চেপে লাভের ফসল ঘরে তুলতে পারলেও তাঁরা চুড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁদের জাত গেলেও পেট ভরেনি।

আসলে চীন-রাশিয়ার দালাল বামেদের কংগ্রেসের সঙ্গে অনৈতিক ও সুবিধাবাদী জোটকে বঙ্গবাসী প্রত্যাখ্যান করেছেন। বামদলগুলিকে এরাজ্যে সাইনবোর্ডে পরিণত করে ছেড়েছেন। তাঁরা বিরোধী দলের মর্যাদাই শুধু হারাননি, হেরেছেন বিপুল ভোটে। এমনকী সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তথা বিরোধীদলের নেতা কমরেড সূর্যকান্ত মিশ্রও জিততে পারেননি। ১৬-র নির্বাচন বামেদের ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্নভঙ্গই করেনি, ভঙ্গ করেছে তাঁদের রাজনৈতিক মেরুদণ্ডও। তাই অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা উঠে দাঁড়াতে পারবেন কি না তা সময়ই বলবে। তবে বামেদের দুর্দশা দেখে একটা কথাই মনে পড়ে,— 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।'

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

সর্বনাশা সিরিয়াল

বর্তমানে দূরদর্শনের পর্দায় বেশিরভাগ চ্যানেলে ৯০/৯৫ ভাগ মহিলাদের একমাত্র দেখার বিষয় হচ্ছে বিভিন্ন কল্পিত কাহিনির বহু এপিসোডের সিরিয়াল। কারণ যারা এইসব মুখরোচক সিরিয়াল দেখে তাদের জন্য ও বিভিন্ন কোম্পানির উৎপাদিত বহু দ্রব্য ব্যবহারের জন্য স্পনসর করে থাকেন বহু টাকা বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ করে। তাই অনেকদিন ধরে এই প্রচারের জন্য বিভিন্ন কোম্পানি তাদের স্বার্থে ও চ্যানেলগুলি নিজেদের রোজগারের জন্য মাথামুণ্ডু নেই এইরূপ কল্পিত কাহিনির সিরিয়ালকে দীর্ঘায়িত করে। আধঘণ্টার সিরিয়ালে বিজ্ঞাপনের জন্য ধরা থাকে নয় নয় করে ১৫/১৬ মিনিট। ওই ছোটো সময়টুকুর জন্য প্রায় নিষ্কর্মা যারা তারা বাইরে দরকারি কাজ না করে বাড়িতে টিভির পর্দার সামনে বসে একেবারে গিলে ফেলে। ওইটুকু সময় তাদের ই, ঈ জ্ঞান থাকে না, তাদের ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না। তাদের তখন স্বামীপুত্র চুলোয় যাক আগে কী করে স্বামীকে বশ করে স্বামীর অমতের কাজগুলো করতে হয়, যেটা টিভির পর্দায় ঘটা করে দেখানো হয়, সেগুলো গলাধঃকরণ করে। বর্তমানে ৬০/৭০ ভাগ সংসারের অশান্তির একমাত্র কারণ এই টিভি সিরিয়াল।

কল্পিত কাহিনিতে দেখানো হয় দজ্জাল বউ কীভাবে স্বামীকে নিজের বশে রাখবে, একান্নবর্তী পরিবারটিকে কীভাবে কানে মন্ত্র দিয়ে ভেঙে আলাদা থাকার ব্যবস্থা করবে কারণ একান্নবর্তী পরিবারে বর্তমানের পাশ করা বড়লোকের মেয়ে যারা একটু বেশিমাত্রায় উন্নাসিক হয় তারা স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিজের ইচ্ছামত ও সংসারের অনিচ্ছামত কাজগুলি করতে পারে না। আপনি কোপনির সংসারে ওইগুলি করলে কোনো সাক্ষী থাকবে না।

এই প্রকার সিরিয়ালে দুই পক্ষের ব্যাপারটা প্রায় একই রকম। প্রথমে বলা যাক সংসারের বউ-য়ের কথায়— (১) সিরিয়ালে শুধু দেখানোই হয় না শেখানোও হয় কীভাবে শাশুড়িকে তাঁবে রাখতে হয়, বাকি দেওর ভাশুরদের বাঁদর বানিয়ে রাখতে হয়। কেউ কোনো প্রতিবাদ করে না কারণ শান্তিপ্রিয় মানুষেরা কেউই অশান্তি চায় না। আবার ওই বউটির স্বামীর যদি আয় বেশি হয়, তা সদুপায়েই হোক আর অসদুপায়েই হোক, তিনি যদি সংসার খরচ অপর সকলের থেকে বেশি দেন তো সোনায় সোহাগা। স্বামীর ওই বউটির হার হাইনেসের মতো কর্তৃত্ব সকলকে মেনে নিতে বাধ্য করে নাহলেই হুমকি 'তাহলে আমরা আলাদা থাকব'।

অপরপক্ষে শাশুড়িরাও যে ধোওয়া তুলসীপাতা নয় তাও দেখানো হয়। যদি কম সোনা ও দেনাপাওনা কম নিয়ে কোনো পুত্রের বিবাহ হয় তবে মাস যেতে না যেতেই গঞ্জনা শুরু হয়। বউদের শুনতে হয় হাঘরের বেটি তো তাই, শুধু তো শাঁখা সিঁদুর দিয়ে এনেছি যা বলব তাই করবে বুঝেছ বলে বউকে হুমকি দেয়। তবে ওই শাশুড়ির মেয়ের শাশুড়ি সম্পর্কে কিছু বলেন না কারণ মেয়ের কপাল যদি পোড়ে। সকল বৌদের নিজের শাশুড়ি খারাপ আর ভাজের শাশুড়ি ভালো। এসবই কিন্তু মুখের কথা নয় সব সিরিয়ালে দেখানো ও দজ্জাল মেয়েদের শেখানো হয়। আর যেটা সম্পূর্ণভাবে নিজের পক্ষে যাবে সেই অংশটুকু শিখে এবং গিলে নেয়--- সবই টিভির সিরিয়ালের কল্যাণে। বাকিটুকু বাদ দেয়। এই সিরিয়ালে এতই মগ্ন থাকে যে বাড়িতে কেউ এলো, দরজা খুলল চাবি খুলল সিরিয়াল দর্শকের কোনো খেয়াল থাকে না। এভাবেই চুরি ডাকাতি হয় তাতেও দর্শকের সম্বিত ফেরে না। এই টিভি সিরিয়াল যে-কোনো সংসারের অশান্তির মূল কারণ।

—দেবপ্রসাদ সরকার,
মেমারী, বর্ধমান

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক দলের ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি

বিপ্লব বসু

এপ্রিল ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি হিন্দুদের সামনে সব থেকে বড় বিপদ হলো ইসলামিক মৌলবাদী শক্তির বাড়বাড়ন্ত। ১৯৪৭ সালে ভারত তথা বাংলাকে ভাগ করে খণ্ডিত পশ্চিমবাংলা সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট লাহোর, কলকাতা ও নোয়াখালিতে মুসলিম লীগ গুণ্ডা ও সমাজ-বিরোধীরা ডাইরেক্ট অ্যাকশনের মাধ্যমে শিখ ও হিন্দুদের উপর অত্যাচার শুরু করে। পূর্ববঙ্গ জুড়ে বাঙালি হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার, লুঠ, খুন, ধর্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমে দাঙ্গা লাগানো হয়। ১৯৪৬ সালের পর থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বাঙালি হিন্দু জনগণ সর্বস্বান্ত হয়ে এই পশ্চিমবাংলায় চলে আসতে এক প্রকার বাধ্য হয়েছেন। তাদের হয়ে বলবার কেউ নেই। প্রায় তিন চারকোটি বাঙালি হিন্দু এযাবৎ পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ থেকে অত্যাচারিত ও লুণ্ঠিত হয়ে এই পশ্চিমবঙ্গে এসেছে। আজ পর্যন্ত তাদের কোনো আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়নি বা সম্পত্তি বিনিময় করতে দেওয়া হয়নি। অথচ তারাই বঞ্চনার শিকার হয়েছে বেশি। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর পূর্ব বাংলা থেকে আগত তিন চার কোটি বাঙালি হিন্দু জনগণ ভোট দিয়ে এসেছে। কিন্তু তারা প্রথমে গান্ধীবাদ ও পরে মার্কসবাদের পাল্লায় পড়ে মুর্খের মতো আচরণ করেছে। কারণ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সৃষ্ট এই পশ্চিমবাংলায় তারা এসে মান-সম্মান বাঁচিয়েছে, অথচ তারা এযাবৎ নিজেদের শত্রুকেই ভোট দিয়ে এসেছে। দেশভাগের আগে কংগ্রেস ও অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি হিন্দুদের শত্রু সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগকেই সর্বতোভাবে সমর্থন করেছিল। বর্তমানে নির্লজ্জ মুসলমান তোষণের জন্য এই পশ্চিমবাংলাতেও বাঙালি হিন্দুরা নিরাপদে বসবাস করতে ভয় পাচ্ছে। সারা বাংলায় ইসলামিক মৌলবাদীরা দেশবিরোধী স্লোগান দিচ্ছে এবং থানা আক্রমণ করে সরকারি নথি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশি উগ্রপন্থী জামাত জঙ্গিদের সাহায্যে এরা পশ্চিমবাংলার শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করে তুলছে। এরাই আবার এ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে এবং নারীপাচার, শিশুপাচার, ধর্ষণ প্রভৃতি ঘৃণ্য ঘটনা ঘটাচ্ছে। অতি সম্প্রতি মালদা জেলার কালিয়াচকে হাজার হাজার মৌলবাদী মুসলমান বহু গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি জ্বালিয়ে দেয় ও দেশবিরোধী স্লোগান দেয়। এছাড়া দেগঙ্গা, উস্তি, ক্যানিং, উত্তর দিনাজপুর, আসানসোল, পশ্চিম মেদিনীপুর, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থানে মৌলবাদীদের ঘৃণ্য কার্যকলাপ পশ্চিমবাংলার বাঙালি হিন্দুদের নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচন কি আদৌ শান্তিপূর্ণ ভাবে হবে, না কি দিকে দিকে বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট হবে? স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শাসকদল নগ্নভাবে মুসলমান তোষণ করে চলেছে। আজও পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু হিন্দুরা মুসলমান মৌলবাদীদের দ্বারা লুণ্ঠিত, অত্যাচারিত, ধর্ষিত, বিতাড়িত ও সর্বস্বান্ত হয়ে উদ্বাস্তু জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

স্বাধীনতার পর থেকে কী কংগ্রেস সরকার, কী যুক্তফ্রন্ট সরকার, কী বামফ্রন্ট সরকার, কী তৃণমূল সরকার সকলেই নক্কারজনক ভাবে মুসলমান তোষণ করে চলেছে। ভোটের জন্য ধর্মের নামে, রাজনীতির নামে, যতরকম অনৈতিক ও দেশবিরোধী কাজে তারা উগ্র মুসলমান সম্প্রদায়কে সাহায্য ও সহযোগিতা করে চলেছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামীদিনে পশ্চিমবাংলায় বাঙালি হিন্দুদের সমূহ বিপদ ঘনিয়ে আসবে। হিন্দুদের ভুলে গেলে চলবে না যে, নেহরুর চক্রান্তে তৈরি 'মুসলিম পারসোনাল ল'-এর মাধ্যমে ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা বিপজ্জনক ভাবে বেড়েই চলেছে। অবৈধ মুসলমান অনুপ্রবেশ ও বিতাড়িত হিন্দু শরণার্থীর চাপে পশ্চিমবঙ্গে আগামী দিনে এক বিরাট খাদ্যসঙ্কট ও নিরাপত্তা-সঙ্কট দেখা দেবে। ফুরফুরা শরিফের তথাকথিত পীরবাবা সিদ্দিকি এক সভায় বলেছেন, বিগত ৩৪ বছরের বাম সরকারকে মুসলমানরা বিতাড়িত করেছে, তাদের দাবি না মানলে এই তৃণমূল সরকারকেও তারা সরিয়ে দেবে। রেড রোডে ইদের দিনে যিনি নমাজ পড়ান সেই ইমাম কচির ফজলুর রহমান বলেছেন যে, আমরা অর্থাৎ মুসলমান জনগণই ঠিক করবে পশ্চিমবঙ্গে কে রাজত্ব চালাবে। কারণ এখানে মুসলমানরাই ২৭ শতাংশ। মুসলমান মৌলবাদীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে স্বাধীনতার পর থেকে শাসক কংগ্রেস সরকার, যুক্তফ্রন্ট সরকার, বামফ্রন্ট সরকার, তৃণমূল সরকার এ রাজ্যে ক্ষমতা দখল করেছে। তারা হিন্দু জনগণকে নানা ভাবে বঞ্চিত করেছে। হিন্দুরা সরকারকে কর দেয় আর সেই করের টাকায় মুসলমানরা ধর্মপালন করতে অর্থাৎ হজে যেতে অনুদান পায়। এছাড়া অন্য সাহায্যও পায়। এসবই ভোটব্যাঙ্ককে মাথায় রেখে। বিগত কংগ্রেস সরকার নির্লজ্জ মুসলমান তোষণ ও হিন্দুদের ভয় দেখিয়ে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করেছে। পরবর্তীকালে যুক্তফ্রন্ট ও বামফ্রন্ট সরকারও নির্লজ্জ মুসলমান তোষণ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিন্দুদের কাছ থেকে তোলা আদায়ের মাধ্যমে ও ভয় দেখিয়ে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করেছে। এই তৃণমূল কংগ্রেস সরকারও নির্লজ্জ মুসলমান তোষণ করে চলেছে। কিছু মুসলমান মৌলবাদীকে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থীও করেছিল। ভোটব্যাঙ্ক অটুট রাখতে মুসলমান তোষণ ও হিন্দু বঞ্চনা তথা হিন্দু নিপীড়ন এক সঙ্গে চালাচ্ছে এই তৃণমূল সরকার। বিভিন্ন স্থানে হিন্দুরাই খুন হচ্ছে বেশি। পশ্চিমবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে আজও সমান তালে হিন্দু নিধন যজ্ঞ চলছে। তিন-চার কোটি বাঙাল ভোট যদি ঠিক স্থানে পড়তো তবে আজ থেকে ৪০ বৎসর পূর্বেই পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠিত হোত। আগামীদিনে তিন কোটি ওপার থেকে আসা হিন্দু ও তিন-চার কোটি এপার বাংলার হিন্দু এই পশ্চিমবাংলা ফেলে যেতে বাধ্য হবে। কারণ, যাদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনছে তারা তো হিন্দুদের মঙ্গল চায় না।

পরম্পরা

তাজমহলের শীর্ষদেশ।

সংখ্যাতত্ত্বে হিন্দু ঐতিহ্য

অষ্টকৌণিক স্থাপত্যশৈলী

ওম প্রকাশ ঘোষ রায়

অষ্ট অর্থাৎ ৮ সংখ্যাটি অতি প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুদের সকল ধর্মীয় কর্মপদ্ধতি, বিশেষ করে মন্দির, প্রাসাদ, স্মারকস্তম্ভ, দুর্গ, সৌধ নির্মাণের ক্ষেত্রে সবিশেষ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও তন্ত্র মন্ত্র জপ তপ ও হোমের মতো পবিত্র ধর্মীয়বিধি পালনের ক্ষেত্রে ৮ সংখ্যাটি ১০০, ১০০০ ও ১০০০০ ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত করে ১০৮, ১০০৮, ১০০০৮ সংখ্যাসমূহ সাধন ভজন পূজন ও মন্ত্রপূত করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই ৮ সংখ্যাটি ছাড়াও ৩, ৫ এবং ৭-এর বহুবিধ প্রয়োগ হিন্দুশাস্ত্রে প্রচলন রয়েছে। যেমন তিন বা ‘ত্রি’-র ক্ষেত্রে ত্রিকাল, ত্রিকুল, ত্রিকূট, ত্রিকোণ, ত্রিগঙ্গ, ত্রিগুণ, ত্রিজগৎ, ত্রিতাপ, ত্রিদশ, ত্রিদিব, ত্রিদোষ, ত্রিধারা, ত্রিনয়ন, ত্রিপত্র, ত্রিপথ বা ত্রিপাদ, ত্রিপিটক, ত্রিবর্গ, ত্রিবিদ্যা, ত্রিবেণী, ত্রিবেদ, ত্রিভঙ্গ, ত্রিভুজ, ত্রিভুবন, ত্রিমূর্তি, ত্রিযামা, ত্রিলোক, ত্রিলোচন, ত্রিশূল, ত্রিসন্ধ্যা ইত্যাদি। পাঁচ বা ‘পঞ্চ’-এর ক্ষেত্রে পঞ্চকর্ম, পঞ্চকোষ, পঞ্চগব্য, পঞ্চতপা, পঞ্চতিক্ত, পঞ্চতীর্থ, পঞ্চদেবতা, পঞ্চপত্র, পঞ্চপ্রদীপ, পঞ্চবটী, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চবর্ণ, পঞ্চবাণ, পঞ্চবায়ু, পঞ্চভূত, পঞ্চ-মকার, পঞ্চমুখ, পঞ্চযজ্ঞ, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশর, পঞ্চানন, পঞ্চামৃত ইত্যাদি। সাত বা ‘সপ্ত’-এর ক্ষেত্রে সপ্তদ্বীপ, সপ্তধা, সপ্তপদী, সপ্তপাতাল, সপ্তরথী, সপ্তলোক, সপ্তসমুদ্র, সপ্তর্ষি ইত্যাদি।

এখানে শুধুমাত্র ৮ সংখ্যার আলোচনার ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রামায়ণের কাল থেকেই হিন্দু ঐতিহ্যের অঙ্গ হিসেবে আট কোণা শিবিরস্তম্ভের প্রচলন ছিল। রামায়ণে উল্লেখ রয়েছে যে ভগবান রামচন্দ্রের রাজধানী অযোধ্যাও অষ্টকোণাকৃতি। হিন্দু ঐতিহ্যে রয়েছে অষ্টদিকের এক একটি সুনির্দিষ্ট নাম এবং প্রত্যেক দিকের একজন করে অধিপতি। আর ঊর্ধ্ব ও অধঃ এই দুই দিক আকাশ ও পাতাল মিলিয়ে দশ দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথাগত কারণে হিন্দু সৌধগুলি গঠিত হয়েছে আটকোণ হিসাবে। আর এভাবেই চন্দ্রমৌলিশ্বর মন্দির (তথাকথিত তাজমহল)-এর আকৃতি ও চূড়া এবং স্তম্ভ হিন্দু স্থাপত্যরীতি অনুযায়ী তৈরি হয়েছে। মুসলমান সম্রাটরা বিশেষ করে শাজাহান চন্দ্রমৌলিশ্বর মন্দিরগাত্রের মর্মর পাথরে কুরআনের বাণী খোদাই করেছে মাত্র। তাজমহল যে হিন্দু স্থাপত্যে নির্মিত সেই সম্পর্কে কিছু তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। বর্তমানে যেখানে মমতাজ ও শাহজাহানের কবর রয়েছে সেখানে সম্ভবত আজও শিবলিঙ্গটি রয়ে গেছে। কেননা এই কবরের চারপাশে জাফরির ওপরের ঢাকনায় হিন্দুদের ১০৮টি পবিত্র কলসের প্রতীক খোদিত রয়েছে। কলস হিন্দু ধর্মের পবিত্র প্রতীক। কলস হচ্ছে কুম্ভ, আর এই কুম্ভ হিন্দুদের সকল পূজা অর্চনায় ব্যবহৃত হয়ে

গুজরাটের অক্ষরধাম মন্দির।

থাকে। দেবতা কর্তৃক অমৃত বহনকারী কুম্ভ থেকে অমৃত ছলকে পড়াতে পবিত্রতম ৪টি স্থান উজ্জয়িনী (শিপ্রা নদীর তীরে), নাসিক (গোদাবরী তটে), হরিদ্বার (গঙ্গার তীরে) এবং প্রয়াগে (ত্রিবেণীসঙ্গমে) প্রতি বারো বছর পর পর কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

তাছাড়া হিন্দু ঐতিহ্যে ৮ এবং ১০৮ সংখ্যাগুলির গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ রয়েছে। ঈশ্বরের প্রতিনাম বা পবিত্র মন্ত্রও ১০৮ বা তার গুণনীয়কে উচ্চারিত হয়ে থাকে। হিন্দু জপমালাতে রুদ্রাক্ষের সংখ্যাও ১০৮। হিন্দুরাজার মন্ত্রী পরিষদের সদস্য সংখ্যাও হোত ৮ জন। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের অষ্টপ্রধান ছিলেন। যোগ সিদ্ধিও ৮ রকমের। হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদেরও ৮টি বিভাগ। আবার মন্দিরশীর্ষের চূড়াতে ধাতুস্তম্ভে ৮টি ধাতুর মিশ্রণ রয়েছে। হিন্দু বিবাহ মন্ত্রে ৮টি পবিত্র বিভাগ রয়েছে। হিন্দু রাজকীয় চিহ্নেও ৮টি পবিত্র বস্তুর প্রতিমূর্তি থাকতো। হিন্দুনগর, দুর্গ, প্রাসাদ অষ্টকৌণিক ভাবে নির্মিত হোত। রাজকীয় মোহরও ছিল ৮ কোণাকৃতি। হিন্দু সঞ্জীবনী রসায়ন চ্যবণপ্রাসের ৮টি প্রয়োজনীয় উপাদান রয়েছে। হিন্দু সাধুসন্তের নামের পূর্বে ১০৮ বা ১০০৮ সংখ্যাগুলি সংযোজিত হয়। আর একইভাবে তাজমহলও অষ্টকোণাকৃতি। তাজমহলের পূর্ব ও পশ্চিম দিকের দু'টি লাল পাথরের বাড়ি যা শিবমন্দিরের ধর্মশালা ও সরাই হিসেবে ব্যবহৃত হোত তাও কিন্তু অষ্টকোণাকৃতির।

এই আটকোণের কোনো প্রয়োগবিধি ইসলামি ঐতিহ্যে দেখা যায় না। তাছাড়াও তথাকথিত তাজমহলের চার কোণায় অবস্থিত চারটি মর্মরস্তম্ভ কোনো মতেই মসজিদের চূড়া নয়। এগুলি চন্দ্রমৌলিশ্বর মন্দির থেকে বিচ্ছিন্ন করা স্তম্ভ বিশেষ। যার জন্যে তাজমহলকে সমাধি বলে ধরে নেওয়া যায় না। এটি একটি প্রাসাদরূপী শিবমন্দির বিশেষ। যা 'বাদশানামা'য় স্বীকারোক্তির মধ্যে রয়েছে, ''মমতাজের সমাধির জন্য পৌত্তলিক হিন্দুর একটি প্রাসাদরূপী শিবমন্দির জবর দখল করা হয়েছে।'' এই তথ্যটি শাহজাহানের সভাসদ মোল্লা আবদুল হামিদ স্বীকার করেছেন অর্থাৎ 'শাহজাহান জয়সিংহের অধিকারভুক্ত মানসিংহের গম্বুজওয়ালা রাজকীয় প্রাসাদটি দখল করেছিলেন।' নুরুল হাসান সিদ্দিকির বই 'The City of Taj'-য়েও এই স্বীকারোক্তি রয়েছে। আবার Tamniar-এর সাক্ষ্যেও পাওয়া গেছে এই তথ্য, মমতাজকে সমাহিত করার আগেও এটা বিশ্বের পর্যটকদের আকর্ষণ করতো।

আবার অন্যদিকে দেখা যায় যে, সত্যনারায়ণ পূজার বেদী কিংবা হিন্দু বিবাহের বেদী কিংবা ব্রতপার্বণের বেদীর চার কোণায় ৪টি কলাগাছের স্তম্ভ তৈরি করা হয়ে থাকে। এই হিন্দু রীতি মেনে তাজমহলের স্তম্ভ ৪টি তৈরি করা হয়েছে। এই রকম ৪টি স্তম্ভ তৈরি করার রেওয়াজ কোনো মতেই মুসলমান রীতির বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। মুসলমান শাসকরা হিন্দুমন্দির ধ্বংস করে এই স্তম্ভ নির্মাণের নিয়মটিকে শুধুমাত্র আত্মসাৎ করেছে। তাছাড়াও রাজস্থানের পিলারী শহরের সর্বসাধারণের জন্য নির্মিত ভিত্তির চারকোণে ৪টি স্তম্ভ রয়েছে দেখা যায়। উল্লেখ্য, তাজমহল অর্থাৎ চন্দ্রমৌলিশ্বর মন্দিরের যে কক্ষটিতে শাহজাহান মমতাজের কবর তৈরি করেছে সেটি এবং ১৬৬৬ খৃ. আওরঙ্গজেব তার পিতা শাহজাহানকে কবরে রেখেছে সেই কক্ষটিও আট কোণা বিশিষ্ট। আর হিন্দুধর্মীয় শাস্ত্র মতে এই কক্ষটিই চন্দ্রমৌলিশ্বর মহাদেবের মন্দির হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এটি যে মহাদেবের মন্দির ছিল তার প্রমাণ হচ্ছে তাজমহলের শীর্ষে রয়েছে মহাদেবের ত্রিশূল ও এর উদ্যানে রয়েছে বেল, জবা ইত্যাদি পবিত্র বৃক্ষ এবং সমাধি কক্ষের চারিপাশের মর্মর পর্দায় পবিত্র ওঁ শব্দটির পুষ্পাকৃতি নকশার কারুকার্য। এছাড়াও গম্বুজের উপরের শীর্ষ দণ্ডের গোলাকার অংশটি হিন্দুদের কলসের দু'দিকে দুটি পাতা ও তার উপর রয়েছে হিন্দুদের পবিত্র নারিকেল।

এমনিভাবেই ভারতবর্ষের প্রায় সকল হিন্দু মন্দির, স্তম্ভ, সৌধ, প্রাসাদ, দুর্গ মুসলমান শাসকরা জবর দখল করে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে। এমনি সব বানানো অত্যুক্তির কারণেই মনে হয় যে দিল্লীর তথাকথিত কুতুব মিনারটিও সম্ভবত কতুবউদ্দিন একা কিংবা ইলতুতমিস একা কিংবা তারা দু'জনে যৌথভাবে তৈরি করেছে। আলাউদ্দিন খিলজি এবং ফিরোজশাহ তুঘলকও আংশিক নির্মাণ করেছিল। দিল্লীর মেহেরৌলী এলাকায় কুতুবমিনারটির অবস্থিতি। এই মিহেরৌলী শব্দটির উৎপত্তি 'মিহিরওয়ালী' হতে। 'মিহির' হলো সম্রাট বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার এক রত্ন জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির। কুতুবমিনারের এই এলাকাতে তদানীন্তনকালে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র ছিল ও 'কুতুবমিনার'টি ছিল তাদের পর্যবেক্ষণ টাওয়ার বা স্তম্ভ। যা 'মেরুস্তম্ভ' নামে পরিচিত ছিল। যার আরবি ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ 'কুৎবমিনার' কালক্রমে হয়ে যায় 'কতুবমিনার'। যেহেতু মুহম্মদ ঘোরির প্রিয় ক্রীতদাস কুতুবউদ্দিন দিল্লীর সুলতান হয়ে বসার পরে এই মেরুস্তম্ভের অনেক দূরে একটি মসজিদ নির্মাণ করে এবং তাকে বলা হলো 'কুতুবুল ইসলাম'। আর 'মেরুস্তম্ভ'টির সঙ্গে মসজিদটির নামের আংশিক মিল থাকতে স্তম্ভটিতেও তার নাম জুড়ে দেওয়া সহজ হয়েছে। যদিও এই মেরুস্তম্ভের চারিপাশে ২৭টি নক্ষত্রের নামে ২৭টি মন্দির ছিল (অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বষাঢ়া, উত্তরষাঢ়া, অভিজিত, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতাভিষা, পূ. ভাদ্রপদ, এবং উ. ভাদ্রপদ। এদের সঙ্গে ধ্রুবতারা মিলিয়ে ২৮ নক্ষত্র হয়)। এই সব মন্দিরে নানান দেবদেবীর মূর্তি নক্ষত্রের নামে পূজিতা হোত। বর্বর কুতুবউদ্দিন সেই সব মন্দির ধ্বংস করে শুধু নয় ১১৯২ সালে তরাইনের যুদ্ধে, ১১৯৬ সালে গোয়ালিয়র দুর্গ জয়ে, ১১৯৭ সালে গুজরাট ও নাহরওয়ালা অভিযানে, ১২০২ সালে কালিন্দর দুর্গ আক্রমণে, ১২৯৪ সালে কাশী ও অজয়মেরু অভিযানকালে কয়েক কোটি হিন্দু নরনারী ও শিশু নির্মম ভাবে কোতল করে এবং হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে মসজিদে রূপান্তরিত করে। তার বিবরণ পাওয়া যায় হাসান নিজামির 'তাজ উল

মাসির' গ্রন্থে, মিনহাজ-উস-সিরাজের 'তারাকৎ-ই-নাশিরি' গ্রন্থে। হিন্দু নিধন, ধর্মান্তরকরণ ও মন্দির ধ্বংসের এমন পশুস্তরের বর্বর কুতুবউদ্দিনের পক্ষে কীভাবে একটি মিনার নির্মাণ সম্ভব তা কল্পনাও করা যায় না। তেমনি বিশ্বাস করা যায় না একই চরিত্রের অধিকারী শাহজাহানের পক্ষে তাজমহল তৈরির মতো গল্প। যদিও কেউ কেউ মনে করে ক্রীতদাস কুতুবউদ্দিন ও তার ক্রীতদাস আলতামাস দুজনে মিলে 'কুতুবউল ইসলাম' নামে যে মসজিদ ২৮ নক্ষত্রের মন্দির ভেঙে তৈরি করেছিল তার জন্য আজানের সুবিধার্থে কুতুব মিনারটি নাকি তারা তৈরি করেছে। কিন্তু লক্ষণীয়, প্রায় ২২৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এই স্তম্ভটি ওই মসজিদের থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। সাধারণত মসজিদের আজানের মিনার থাকে মসজিদের গায়ে লাগানো অবস্থায়। এক্ষেত্রে তা নেই। সঠিক বৃত্তান্ত হচ্ছে মুসলমানদের ভারতবর্ষে আগমনেরও প্রায় ৮০০ বছর আগে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে জ্যোতির্বিদ্যাচার্য বরাহমিহির নিজ তত্ত্বাবধানে রাজপুত কারিগর দিয়ে হিন্দু স্থাপত্য রীতি অনুযায়ী এই 'মেরুস্তম্ভ'টি তৈরি করান। অতীতে কুতুবমিনারের জমিতে নানারকম রেখা অঙ্কিত ছিল যা থেকে নির্ভুলভাবে সময় নির্ণয় এবং কোন রাশিতে সূর্য অবস্থান করছে তা তার ছায়া থেকে নিরূপণ করা যেত। কিন্তু আজ সেসব জ্যামিতিক রেখা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। (পণ্ডিত কমলা প্রসাদ মণি প্রকাশিত 'শ্রী মিহিরাচার্য বংশাবলী গ্রন্থ')। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে বরাহমিহির সংস্কৃত 'অহোরাত্র' শব্দের 'অ' ও 'ত্র' বাদ দিয়ে 'হোরা' নামে সময়ের একটি নতুন একক সৃষ্টি করেছিলেন এবং ২৪ ঘণ্টায় ১ দিন রাত্রি নিরূপণ করার মাপ চালু করেন। যতদূর সম্ভব এই Hora থেকেই ইংরেজি Hour শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় ১ দিন রাত্রি গণনার প্রচলন হয়েছে। সেই বরাহ মিহিরের পক্ষে একটা পর্যবেক্ষণ স্তম্ভ নির্ণয় করা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

আবার কুতুবুল ইসলাম মসজিদটির দেওয়ালে একটি পাথরে লেখা আছে, 'সূর্য মেরুপৃথ্বীঃ যন্ত্রৈঃ মিহিরাবলী যন্ত্রেন' তা লৌহ স্তম্ভটির গায়ে লেখা লিপিতে যে ব্রাহ্মী অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে, এই কথা ক'টি সেই একই ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে মসজিদটিও মন্দির ভেঙে তৈরি করেছে কুতুবউদ্দিন। যদিও মিনারের গায়ে কুতুবউদ্দিন ও আলতামাসের কোনো শিলালিপি নেই। কিন্তু গিয়াসউদ্দিন ঘোরির ১ খানা শিলালিপি কুতুবমিনারের গায়ে রয়েছে যেটা সংস্কারের নামে সাবেক মেরু স্তম্ভটির সকল হিন্দুচিহ্ন বিলুপ্ত করে তার গায়ে কোরানের বাণী উৎকীর্ণ করে স্তম্ভটিকে পুরোপুরি ইসলামিকরণ করে কুতুবমিনারে রূপান্তরের শেষ পেরেক মারা হয়েছে। এমনি ভাবেই ভারতবর্ষের চন্দ্রমৌলিশ্বর মন্দির-সহ সকল হিন্দু মন্দির, স্তম্ভ, দুর্গ, সৌধ, প্রাসাদ ইত্যাদির গায়ে কোরানের বাণী উৎকীর্ণ করে ইসলামিকরণের কাজ সম্পাদন করেছে বহিরাগত মুসলমান শাসকরা। আবার এই কুতুবমিনারের পশ্চিমে ছোট্ট একটি টিলার উপর মা কালিকাদেবীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ রয়েছে যা 'সুরজ কি ঠিকরি' নামে পরিচিত। অর্থাৎ স্তম্ভের চারিপাশে বহু মন্দির ছিল যা আজ আর নেই। আবার সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য দ্বারা নির্মিত যে লৌহ স্তম্ভটি কুতুবমিনারের পাশে বসানো আছে তাতে কুতুবমিনারের অর্থাৎ মেরুস্তম্ভের কথাও উল্লেখ রয়েছে, কুতুব মিনারকে তাতে 'প্রপাংশু বিষ্ণুধ্বজ' বলা হয়েছে (পণ্ডিত কেদারনাথ প্রভাকর সম্পাদিত 'বরাহমিহির স্মৃতিগ্রন্থ')। পরিশেষে এটাই বলা সমীচীন মনে করি যে, কুতুবমিনার কুতুবউদ্দিন বা আলতামাস দুজনের কেউ তৈরি করেনি। এটি দখল করা 'মেরুস্তম্ভ' যা প্রাক ইসলামি যুগে হিন্দুদের দ্বারা নির্মিত স্মারক স্তম্ভ।

তাজমহলের শীর্ষদেশে ঘট, আমপাতা ও নারকেল।

তথ্যসূত্র :

(১) তাজমহল এক হিন্দু মন্দির : পি এন ওক, (২) মিথ্যার আবরণে : দিল্লী আগ্রা ফতেপুর সিক্রি : ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, (৩) এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা Vol-I : 1964, (৪) ভারতীয় বিদ্যাভবন বাই আর সি মজুমদার, (৫) ইতিহাস দর্পণ : আচার্য বাপু বনকর।

পান্তাবুড়ির কথা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

এক যে ছিল পান্তাবুড়ি, সে পান্তাভাত খেতে বড্ড ভালোবাসত। এক চোর এসে রোজ পান্তাবুড়ির পান্তাভাত খেয়ে যায়, তাই বুড়ি লাঠি ভর দিয়ে রাজার কাছে নালিশ করতে চলল। পান্তাবুড়ি পুকুর ধার দিয়ে যাচ্ছিল। একটা শিঙিমাছ তাকে দেখতে পেয়ে বললে, ‘পান্তাবুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?’ পান্তাবুড়ি বললে, ‘চোরে আমার পান্তাভাত খেয়ে যায়, তাই রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি।’ শিঙিমাছ বললে, ‘ফিরে যাবার সময় আমাকে নিয়ে যেও, তোমার ভালো হবে।’ পান্তাবুড়ি বললে, ‘আচ্ছা।’ তারপর পান্তাবুড়ি বেলতলা দিয়ে যাচ্ছে। একটা বেল মাটিতে পড়ে ছিল। সে বললে, ‘পান্তাবুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?’ পান্তাবুড়ি বললে, ‘চোরে আমার পান্তাভাত খেয়ে যায়, তাই রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি।’ বেল বললে, ‘ফিরে যাবার সময় আমাকে নিয়ে যেও, তোমার ভালো হবে।’ পান্তাবুড়ি বললে, ‘আচ্ছা।’ তারপর পান্তাবুড়ি পথের ধারে খানিকটা গোবর দেখতে পেলে। গোবর বললে, ‘পান্তাবুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?’ পান্তাবুড়ি বললে, ‘চোরে আমার পান্তাভাত খেয়ে যায়, তাই রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি।’ গোবর বললে, ‘ফিরে যাবার সময় আমাকে নিয়ে যেও, তোমার ভালো হবে।’ পান্তাবুড়ি বললে ‘আচ্ছা।’ তারপর খানিক দূর গিয়ে পান্তাবুড়ি দেখলে, পথের ধারে একখানা ক্ষুর পড়ে রয়েছে। ক্ষুর বললে, ‘পান্তাবুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?’ পান্তাবুড়ি বললে, ‘চোর আমার পান্তাভাত খেয়ে যায়, তাই রাজার কাছে নালিশ করতে

যাচ্ছি।’ ক্ষুর বললে, ‘ফিরে যাবার সময় আমাকে সঙ্গে নিও, তোমার ভালো হবে।’ পান্তাবুড়ি বললে, ‘আচ্ছা।’

তারপর পান্তাবুড়ি রাজার বাড়ি গিয়ে দেখলে, রাজামশাই বাড়ি নেই। কাজেই সে আর নালিশ করতে পেল না। বাড়ি ফিরবার সময় তার ক্ষুর আর গোবর আর বেল আর শিঙিমাছের কথা মনে হলো। সে তাদের সকলকে তার থলেয় করে নিয়ে এল। পান্তাবুড়ি যখন বাড়ির আঙিনায় এসেছে, তখন ক্ষুর তাকে বললে, ‘আমাকে ঘাসের উপর রেখে দাও।’ তাই বুড়ি ক্ষুরখানাকে ঘাসের উপর রেখে দিল। তারপর যখন সে ঘরে উঠতে যাচ্ছে, তখন গোবর বললে, ‘আমাকে পিঁড়ির উপর রেখে দাও।’ তাই বুড়ি গোবরটাকে পিঁড়ির উপর রেখে দিল। বুড়ি যখন ঘরে ঢুকল, তখন বেল বললে, ‘আমাকে উনুনের ভিতরে রাখ।’ শুনে বুড়ি তাই করলে। শেষে শিঙিমাছ বললে, ‘আমাকে তোমার পান্তাভাতের ভিতরে রাখ।’ বুড়ি তাই করল।

তারপর রাত হলে বুড়ি রান্না-খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে রইল। ঢের রাত্রে চোর এসেছে। সে তো আর জানে না, সেদিন বুড়ি কী ফন্দি করেছে। সে এসেই পান্তাভাতের হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে দিল। সেখানে ছিল শিঙিমাছ। সে চোর বাছাকে এমনি কাঁটা ফুটিয়ে দিল যে তার দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। শিঙিমাছের খোঁচা খেয়ে চোর কাঁদতে কাঁদতে উনুনের কাছে গেল। তার ভিতরে ছিল বেল। চোর যেই আঙুল সেঁকার জন্য উনুনে হাত ঢুকিয়েছে, অমনি ফটাস্ করে বেল ফেটে, তার চোখেমুখে ভয়ানক লাগল। তখন সে ব্যথা আর ভয়ে পাগলের মতো হয়ে যেই ঘর থেকে ছুটে বেরুবে, অমনি সেই গোবরে তার পা পড়েছে। তাতে সে পা হড়কে ধপাস করে সেই গোবরের উপরেই বসে পড়ল। তারপর গোবর লেগে ভূত হয়ে বেটা গিয়েছে ঘাসে পা মুছতে। সেইখানে ছিল ক্ষুর, তাতে ভয়ানক কেটে গেল। তাতে আর ‘ও মা গো! গেলুম গো!’ বলে না চেঁচিয়ে বাছা যায় কোথায়? তা শুনে পাড়ার লোক ছুটে এসে বললে, ‘এই বেটা চোর! ধর বেটাকে! মার বেটাকে। কান ছিঁড়ে ফেল!’ তখন যে চোরের সাজাটা।

ভারতের পথে পথে

নবদ্বীপ

বাংলার একটি প্রাচীন সমৃদ্ধ জনপদ নবদ্বীপ। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত এই নগরী শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। এক সময় দেশ-বিদেশ থেকে বহু পণ্ডিত এখানে বিদ্যাচর্চা করতে আসতেন। দর্শন ও সাহিত্যের অন্যতম পীঠস্থান ছিল এই নবদ্বীপ। যুগপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব এখানেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে তিনি ভক্তি আন্দোলনে জোয়ার এনেছিলেন। সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। রচনা করেছেন অনেক গ্রন্থ। নবদ্বীপ বর্তমানে নদীয়া জেলার অন্তর্গত হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্র।

এসো সংস্কৃত শিখি

ভবান্/ভবতী কস্যাং শ্রেণ্যাং পঠতি ?
তুমি (পুং/স্ত্রী) কোন শ্রেণীতে পড়ছ?
অহং দশমকক্ষায়াং পঠামি।
আমি দশম শেণীতে পড়ছি।
অহং বিজ্ঞানবিভাগে পঠামি।
আমি বিজ্ঞান বিভাগে পড়ছি।
ভবত: গৃহং কুত্র।
তোমার বাড়ি কোথায়?
মম গ্রামস্য নাম.......।
আমার গ্রামের নাম.........।

ভালো কথা

বাসে জায়গা দিল

স্কুলবাস আসেনি সেদিন। আমি আর মা পাবলিক বাসে করে বাড়ি ফিরছি। খুব ভিড় বাসে, দাঁড়াবারও জায়গা নেই। আমরা কোনোরকম দাঁড়িয়ে আছি। মায়ের এক হাতে আমার স্কুল ব্যাগ, অন্যহাতে আমাকে ধরে আছে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম তার সামনের সিটেই দু'জন দাদা দিদি বসে ছিল। আমার থেকে অনেক বড় । মনে হয় কলেজে পড়ে। আমরা অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি দেখে দাদাটি জায়গা ছেড়ে দিয়ে আমাকে বসতে দিল। একটু পরে দিদিটিও উঠে দাঁড়াল এবং মাকে বসতে দিল। তখন মা আর আমি দু'জনেই বসে বসে বাড়ি ফিরলাম। সেদিন যদি তারা জায়গা না ছাড়তো তাহলে আমাদের খুব কষ্ট হোত।

ঋতম পাল, ষষ্ঠ শ্রেণী, কলকাতা-১৫

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ত র শু জ	(১) ন শ উ ং বি
(২) ন রা ধা আ	(২) দি প্র ত্য পা তা

১৮ জুলাই সংখ্যার উত্তর	**১৮ জুলাই সংখ্যার উত্তর**
(১) বুন্দেলখণ্ড (২) শৈলশিখর	(১) তক্তপোশ (২) অন্ধকূপ

উত্তরদাতার নাম

(১) তুহিন কুমার বিশ্বাস, গাজোল, মালদা (২) বর্ষা কুণ্ডু, ঈশ্বরপুর, উঃ দিনাজপুর (৩) শুভম মাজি, বাঁকুড়া (৪) প্রিয়ম নাথ, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

স্বচ্ছ ভারত অভিযানের এক গ্রাম্য অগ্রদূত

রিনি রায়

অপরিচ্ছন্নতা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বিরুদ্ধে ‘স্বচ্ছ ভারত অভিযান’ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এক আন্দোলনই বলা চলে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে অত্যধিক জনসংখ্যা, অশিক্ষা, সচেতনার অভাব, ঘিঞ্জি জনবসতি, অর্থাভাব, দারিদ্র্য— এসবের পরিণামে পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতার দৃশ্য স্বভাবতই শূন্য। আমাদের ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম নয়। স্বাধীনতার ৭০ বছর প্রায় পার করতে চললো, অথচ এখনও দেশের অনেক বাড়িতে, স্কুলে শৌচাগার নেই। প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করতে ছুটতে হয় মাঠে, বনে-বাদাড়ে। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের এক অংশ হিসেবে তাই কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে শৌচাগার তৈরিতে জোর দেওয়া হচ্ছে। সচেতনতা প্রসারে অহরহ বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে, ‘যেখানেই ভাবনা, সেখানেই শৌচালয়।’ বলিউডের একজন বিখ্যাত অভিনেত্রীকে এই বিজ্ঞাপনের মুখ করে দেখানো হচ্ছে যে শৌচাগার না থাকায় নববিবাহিতা বধূ নতুন শ্বশুরবাড়ি থেকে পরেরদিনই বাপের বাড়ি চলে এসে স্বামীর কাছে শৌচালয় তৈরির দাবি জানাচ্ছে। এই বিজ্ঞাপনই বলে দিচ্ছে যে শৌচালয় স্থাপনে সরকার কত আন্তরিক।

আপাত দৃষ্টিতে সামান্য অথচ গুরুত্বের বিচারে অনস্বীকার্য এই বিষয়ে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যে কতটা ভাবিত তার পরিচয় মেলে দু’বছর আগে দিল্লীর লালকেল্লা থেকে গণতন্ত্রদিবসের ভাষণে এই বিষয়টির উল্লেখ করায়। একটি পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে যে আমাদের দেশের গ্রামগুলিতে ১-১০ জনের মৃত্যুর কারণ হিসাবে কোনো না কোনো ভাবে স্যানিটেশন সম্পর্কযুক্ত এবং এটাও অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে আমাদের ভারতবর্ষ এই ক্ষেত্রটিতে অনুন্নত এবং গরিব দেশ আফগানিস্তান, বুরুন্ডি এবং কঙ্গোরও পিছনে অবস্থান করছে। এই শৌচাগার না থাকার জন্য স্কুলছুট মেয়ের সংখ্যাও নগণ্য নয়। স্বাস্থ্য শিক্ষা সংক্রান্ত যে বহুবিধ সমস্যা ভারতে বিদ্যমান, সেই সমস্যাগুলির একাংশ কিন্তু শৌচাগার বা স্যানিটেশনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সরকারি ওই বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে বলা যায় যে পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক বিষয়ের উপর নজর রেখে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আন্দোলনে মেয়েদেরই সর্বাগ্রে সামিল হওয়া সমীচীন। নাহলে এ আন্দোলন কখনই সফল হবে না।

সম্প্রতি ছত্তিশগড়ের রায়পুর জেলার সারগাঁও-য়ে এই আন্দোলনের এমনই এক সৈনিকের খবর সংবাদ শিরোনামে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় এসেছে যিনি নিজের নামে ২৪ লক্ষ টাকা লোন নিয়ে গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে, স্কুলে শৌচাগার নির্মাণ করিয়েছেন। নেহাতই এক গ্রাম্য মহিলা, তাঁর অক্ষরজ্ঞানও নেই। সংসার আর গ্রামের সীমানার বাইরে এই বিশাল পৃথিবী সম্বন্ধে কোনো ধারণাও থাকার কথা নয়। তাই ঘোমটা টানা গৃহবধূ প্রমীলা সাহু যখন গ্রামের সরপঞ্চ হলেন, তখন সবাই ঠাট্টা করে বলতে লাগল, “যার নিজেরই কোনো শিক্ষা নেই, সে আবার কী উন্নতি করবে?” বারংবার এই একই বিদ্রূপে বরং দমে না গিয়ে গ্রামে বয়স্ক এবং নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। সংসারের কাজের ফাঁকেই যাতে তারা পড়াশোনা করতে পারে সে বিষয়ে তাদের অনুপ্রাণিত করলেন। শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে সফল হওয়ার পরই তার নজর পড়ে গ্রামবাসীর স্বাস্থ্যের প্রতি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি। তিনি যখন গ্রামের সরপঞ্চ হন, তখন গ্রামের ৭০ শতাংশ বাড়িতে কোনো শৌচালয় ছিল না। আর স্কুলগুলোর কথা তো যত কম উল্লেখ করা যায় ততই ভালো। গ্রামে প্রমীলার আগের সরপঞ্চরা যা ভাবতে পারেনি, তথাকথিত অশিক্ষিত এই গ্রাম্য বধূ লক্ষ্য করেছেন গ্রামে স্যানিটেশনের অভাব। যার ফলে গ্রামে কলেরা, টাইফয়েডের মতো রোগের মাঝেই মাঝেই প্রাদুর্ভাব ঘটত। তাছাড়া রাতদুপুরে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে পোকামাকড়ের কামড় বা অন্যান্য বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা তো আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই এই সমস্যা নিরসনে এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সচেতনতা গড়ে তুলতে নিজের নামে ব্যাঙ্ক থেকে ২৪ লক্ষ টাকা লোন নিয়ে গ্রামের প্রতিটি বাড়ি এবং বিদ্যালয়ে শৌচাগার নির্মাণ করিয়েছেন। এক সময়ে যারা তার নিরক্ষরতাকে বিদ্রূপ করতো, আজ তারাই সেই অশিক্ষিত প্রমীলার প্রেরণায় সুবিধা ভোগ করছে। নিজের কাজের মাধ্যমে এই গ্রাম্যবধূ সকলের সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছেন।

একথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, শ্রীমতী প্রমীলার মতো প্রমীলা বাহিনী ভারতের প্রতিটি গ্রামে যদি থাকে তবে নরেন্দ্র মোদীর এই আন্দোলন সফল হওয়ার পাশাপাশি আমাদের দেশ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে অল্প সময়ের মধ্যেই উন্নত দেশগুলিকে ধরে ফেলতে পারবে।

জাকির নায়েককে নিয়ে ঘনিয়ে ওঠা সমস্যা

অতিথি কলম

ড. জিনাত শওকত আলি

গত সপ্তাহে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে ভিডিও সাক্ষাৎকারে তথাকথিত ধর্মপ্রচারক জাকির নায়ককে কিছুটা রক্ষণাত্মক ও পলায়নপর বলে মনে হচ্ছিল। ওই সাক্ষাৎকারে তিনি মিডিয়া ট্রায়াল, ঘৃণা ছড়ানো ও তৈরি করা ভিডিও সম্প্রচার নিয়ে বিস্তর অভিযোগ করছিলেন। জাকির সন্ত্রাসবাদ, নিরীহ নাগরিকদের ওপর সন্ত্রাসী আক্রমণের প্রসঙ্গে ফ্রান্সের নিসের ঘটনার নিন্দা করার সঙ্গে আই এস আই এস অর্থাৎ ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক ও সিরিয়াকে ইসলাম-বিরোধী আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও স্বীকার করেননি যে ওসামা বিন লাদেন

একজন ঘৃণ্য সন্ত্রাসবাদী ছিল। উল্টে তাঁর বক্তব্য ছিল আমেরিকার ৯/১১-এর ধ্বংসাত্মক আক্রমণ ছিল অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।

আশ্চর্যের বিষয়, আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণের নিন্দা করলেও তিনি তাঁর সঙ্গে একটি উৎকট শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। অন্যপক্ষে ইসলামে নারীর জন্য সমদর্শিতার ও সমান অধিকারের যে কথা আছে তাঁর কোনো উল্লেখ বা ভারতে পরধর্মের সংস্কৃতির ওপর সম্ভ্রম দেখানোর যে রীতি প্রচলিত সে সম্পর্কে বিন্দু বিসর্গও তিনি উচ্চারণ করেননি। অথচ, আজকের বিশ্বব্যাপী আতঙ্কের পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মুসলমান যুবকদের মধ্যে যে উগ্রপন্থা ছড়িয়ে পড়ছে তার উপশমের কোনো রাস্তা দেখানো ছিল একজন যথার্থ ধর্মগুরুর উপযুক্ত কাজ। তিনি সে পথে হাঁটেননি। বাস্তবে আজকের তীব্র আতঙ্কের বাতাবরণে আই এস থেকে বোকো হারাম হয়ে আলসাহাবের সন্ত্রাসবাদী ভাবধারার প্রসারের ফলে ইসলাম এক চ্যালেঞ্জের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। দিন প্রতিদিন প্রধানত মুসলিম যুবকরা উগ্রপন্থার দিকে পা বাড়াচ্ছে। বাড়ছে জিহাদির সংখ্যা ও তাদের বিশ্বব্যাপী সংগঠন। এক্ষেত্রে বিশেষ করে আই এস-এর টোপে একটা বড় অংশ ধরা দিচ্ছে।

> জাকির নায়েক যদি যথার্থই ইসলামের সেবা করতে দীক্ষিত হোত তাহলে সে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে কূটতত্ত্ব আওড়ানো বা ওসামা বিন লাদেনকে সন্ত্রাসবাদী না বলার মতো ঘৃণ্য প্রচার করত না। জাকির নায়েক সমেত সমস্ত ধর্মীয় নেতারই আইনের শাসনকে মেনে চলা বাধ্যতামূলক।

এখন সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরই তাদের যুবকদের নিবৃত্ত করা দরকার। এক্ষেত্রে পূর্বের সমস্ত ধারণা উল্টে দিয়ে দেখা যাচ্ছে উগ্রপন্থা কেবল অশিক্ষিত বা গরিব মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটি অত্যন্ত ভয়ের ব্যাপার। প্রায়শই দেখা যাচ্ছে নানা দিক থেকে উপর্যুপরি গোঁড়া ও অসহিষ্ণুতায় ভরা প্রচারের মাধ্যমে ইসলামিক উন্মাদনা তৈরির প্রয়াস চলছে। যার ফলে ইসলাম যে প্ররোচনা ও আগ্রাসী বিরোধিতার ক্ষেত্রে ধৈর্য (সব্র) ও শান্ততার (রিফ্ক) মাধ্যমেই হিংসা ও ফাসাদ (সমাজের মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করে ধন ও প্রাণহানি ঘটান)-এর মোকাবিলা করার নির্দেশ দিয়েছে তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। ইসলামে মানুষের মর্যাদা রক্ষা ও অন্যায়ের প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ পথে করার আদেশই লিপিবদ্ধ আছে। ইসলাম আরও বলেছে আলাপ আলোচনা ও পারস্পরিক বিশ্বাসের পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে সংঘর্ষের পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে হবে। 'জিহাদ' কথাটি এই প্রচেষ্টা বোঝাতেই ইসলামে ব্যবহৃত হয়েছে। নবি মহম্মদের ট্রাডিশন অনুযায়ী— ''যে ব্যক্তি অত্যাচারের পথ ধরবে সে ইসলামের চৌহদ্দির বাইরে চলে যাবে।"

এর কোনো কিছুই নায়েকের বক্তব্যের মধ্যে ছিল না। পক্ষান্তরে কোনো উদারবাদী মুসলমান মতাবলম্বীর পক্ষ থেকে নয়, বরং শেখ 'আদাল আল কালবানি' যিনি মক্কার Grand Mosque-র পূর্বতন ইমাম ছিলেন এবং নিজেও কট্টর সালাফি পন্থী তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়েছেন আই এস কট্টরবাদী মতবাদেরই গর্ভজাত, তাই এদের সম্পর্কে আমাদের খুবই সংবেদনশীল ও স্বচ্ছভাবে মোকাবিলা করতে হবে।

এই সূত্রে সৌদি আরাবিয় সরকারের পক্ষে প্রচারিত 'আল রিয়াধ' দৈনিক পত্রিকায় পরপর দুটি নিবন্ধে আলকালানি সালফিপন্থীদের একটা অংশের বিরুদ্ধে ইসলাম নির্ধারিত সত্যকে অস্বীকার করে বিরোধীদের হত্যা করাকে মঞ্জুরি দেওয়ার পদ্ধতির তীব্র নিন্দা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই সব মোল্লা, ধর্মগুরু ও সমাজের মাথাদের সাহস করে এই চরম ইসলামিয় বিচ্যুতির খোলাখুলি নিন্দা না করার জন্য তিরস্কার করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি আত্মঘাতী মানববোমা ব্যবহারের বিপক্ষে আক্রমণ শানানো ছাড়াও কবিতা লেখার অধিকার জারি রেখে ফতোয়াও দিয়েছেন। সর্বশেষ আদেশে তিনি মুসলমান মেয়েদের গাড়ি চালানোকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। নায়েক এসব ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গেছেন। এরই বিপরীতে এই জাকির নায়েক তাঁর অনুগামীদের ইসলামে যে পরধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আরব দেশগুলিতে যে পারস্পরিক সংহতির প্রচলন আছে সে সম্পর্কে মোটেই অবগত করেননি। আদৌ জানাননি যে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে দুবাই বা বাহারিনে একই সঙ্গে আজকের দিনেও রয়েছে মন্দির, শ্মশান বা গীর্জার সহাবস্থান। ইউনাইটেড আরব আমিরশাহিতে অন্যধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা সম্মান বিদ্যমান। এখানকার বসবাসকারীরা নিঃসঙ্কোচে কোনো হিন্দু মন্দিরে পূজাপাঠ বা খৃস্টানরা চার্চে, বৌদ্ধ ধর্মীয়রা তাদের প্রার্থনালয়ে, শিখরা তাদের গুরুদ্বারায় অবাধ ধর্মাচরণ করতে পারে। ঠিক একইভাবে দ্বীপদেশ বাহারিনেও হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, শিখদের মন্দির, গীর্জা বা গুরুদ্বারা এমনকী ইহুদিদের সিনাগগ পর্যন্ত রয়েছে।

অত্যন্ত হতাশাজনকভাবে নায়েকের আলোচনায় তুমুল গোঁড়ামি বা নেহাতই মামুলি কিছু কথাবার্তা শোনা গেল, যেখানে আলোকপ্রাপ্ত আধুনিক মূল্যবোধ বা ইসলামে যে 'ইজতেহাদ' বা সৃষ্টিশীল ব্যাখার কথা আছে তার উল্লেখই ছিল না। আর জাকির মুসলমান ও অ-মুসলমানদের ইসলামে সংকলিত যে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গি (Mithaq-C-Medina-the Covenant or the Censtitution of Medina) ধর্মীয় স্বাধীনতা (Q 2 : 256), নারী-পুরুষের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক চর্চায় সমান অধিকার (Q 33 : 35), মানবাধিকার, সর্ব ধর্ম ও জাতপাত নিরপেক্ষভাবে মানুষের মর্যাদা ও সমান অধিকার রক্ষা (Q 17 : 70), শান্তিরক্ষা, আপোশ মীমাংসা ও অহিংসার (Q 5 : 30-34) যে নির্দেশিকা রয়েছে সে সম্পর্কে আদৌ সচেতন ও প্রশিক্ষিত করার কোনো প্রচেষ্টাই করেননি। অন্যদিকে তাঁর 'সালাফি' ও 'ওয়াহাবি' ইসলাম অনুসৃত চরম গোঁড়া ইসলামি প্রচার নেহাতই তাৎক্ষণিক প্ররোচনায় ভরা।

এখানে বলা দরকার, হেটস্পিচ অর্থাৎ বিদ্বেষ ও হিংসা উদ্রেকারী বক্তৃতা দেওয়া সব ধরনের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাদের তরফেই বন্ধ রাখতে হবে। সেই মানদণ্ডেই মাথা কেটে আনতে পারলে ৫০ লক্ষ টাকা পুরস্কার বা জিহ্বা কেটে ফেলতে পারলে আকর্ষণীয় ইনাম ভারতীয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিসরে অত্যন্ত অনভিপ্রেত ও বেমানান।

জাকির নায়েক সমেত সমস্ত ধর্মীয় নেতারাই আইনের শাসনকে মেনে চলা বাধ্যতামূলক। প্রশাসনের তরফে যে সমস্ত নেতা বিদ্বেষী বক্তৃতা দিয়ে সমাজকে ভাঙতে চান তার যথাযথ তদন্ত করে দ্রুততার সঙ্গে শাস্তি বিধান দরকার। তাই নায়েক যদি যথার্থই ইসলামের সেবা করতে দীক্ষিত হোত তাহলে সে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে কূটতত্ত্ব আওড়ানো বা ওসামা বিন লাদেনকে সন্ত্রাসবাদী না বলার মতো ঘৃণ্য প্রচার করত না। ইসলামের সঠিক নির্দেশ প্রচার করে বেপথগামী যুবকদের চরমপন্থার ও পরধর্ম অসহিষ্ণুতার বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে আন্তঃধর্মীয় আলাপ আলোচনা ও সহমর্মিতার যথার্থ পথ নির্দেশ দিতে পারত।

(লেখক ওয়ার্ল্ড ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক স্টাডিজ-এর ডিরেক্টর জেনারেল)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

এ তুমি কেমন মাদার!

উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল

তিনি মাদার! সারা বিশ্বের জননী, বিশেষ করে আর্তের, পীড়িতের। করুণার প্রতিমূর্তি তিনি। সমগ্র বিশ্বের হলেও তাঁকে নিয়ে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ গর্ব। কারণ জন্মভূমি সুদূর ম্যাসিডোনিয়া ছেড়ে তিনি ভারতবর্ষের নাগরিক হয়ে ওঠেন, কলকাতা হয়ে ওঠে তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র। ১৯৪৮ সাল থেকে আমৃত্যু এই শহরের সঙ্গে তাঁর পবিত্র আত্মার যোগ। এই শহরকেই তিনি এনে দিয়েছেন শান্তির জন্য মহার্ঘ নোবেল পুরস্কার।

তাঁর মৃত্যুর ১৯ বছর পর কলকাতার মুকুটে আর একটি সোনার পালক সংযোজিত হতে চলেছে। আগামী সেপ্টেম্বরে ভ্যাটিকান সিটি বহু প্রতীক্ষার পর বহু কাঙ্ক্ষিত 'সন্ত' উপাধি দিতে চলেছে মাদারকে। এবার থেকে তাঁর নব পরিচয় হবে সেন্ট মাদার টেরিজা। আর সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিতে চলেছেন আমাদের সবার প্রিয় 'দিদি'— একেবারে 'ডবল ধামাকা'।

স্বভাবত আমরা বঙ্গবাসীরা আপ্লুত, অভিভূত, আনন্দিত, সম্মানিত। তবু 'কিন্তু' থেকে যায়। মুশকিল হচ্ছে এই 'কিন্তু'টাকে নিয়ে। আর্তের সেবায় এই মহান মানবী সমগ্র জীবন উৎসর্গ করে দিলেও নিন্দুকের অভাব নেই। নিন্দুকদের যা কাজ, কূট সমালোচনায় বিদ্ধ করা, তা তারা মাদারকে নিয়েও করেছে, বিরূপ সমালোচনা করেছে, মাদারের মহতী উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

মাদারের উদ্দেশে পত্রপুষ্প নিবেদন করার পূর্বে প্রচলিত প্রশ্ন তথা 'নিন্দাবাদ'গুলি একবার দেখে নিলে নিশ্চয় মাদারের মহিমা ক্ষুণ্ণ হবে না। আমাদের হাতে একখানা বই আছে যার নাম 'মাদার টেরেজা : মুখ ও মুখোশ'। মূল বই Mother Terassa— The Final Verdict. লেখক অরূপ চট্টোপাধ্যায়, অনুবাদক— রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়। বইয়ের নামটি-ই তো যথেষ্ট অশ্রদ্ধেয়। মনে হতে পারে— উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে হীন চক্রান্তের প্ররোচনায় কালিকলুষের কারসাজি। কিন্তু তার পূর্বে একবার জেনে নেওয়া যাক— যে 'সেবা' কার্যের জন্য মাদার বিশ্ববন্দিত সেই সেবাকে ভারতীয় সনাতনী দৃষ্টি কীভাবে দেখে।

অবতার পুরুষ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলেছিলেন— 'জীবে দয়া নামে রুচি'। আর এক অবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন— 'জীবে সেবা'। জীবের সঙ্গে আমার সেব্য-সেবকের সম্পর্ক। কিন্তু সেবা করবই বা কেন? কারণ জীব জীব নয়, জীবমাত্রই শিব। তাই জীবে সেবা মানেই শিবের সেবা। তাঁর এই মহান বাণীকে মূর্ত করে তুলেছিলেন তাঁর যোগ্য শিষ্য বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। এই সেবা পুরো নিঃস্বার্থ এবং নিঃশর্ত। প্রতিদান বা প্রত্যুপকারের লেশমাত্র বাসনা তাতে থাকার কথা নয়। বরং সেবক কৃতজ্ঞ থাকবে সেব্যের কাছে। এই সেবাধর্মের আলোকে আমরা দেখে নিতে পারি 'মাদার'-এর সেবাকর্মের কিছু নমুনা।

১৯৯৫ খৃষ্টাব্দের বর্ষায় বাংলার এক বিস্তৃত অংশ বন্যায় বিধ্বস্ত হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ দুর্গতির মধ্যে দিন কাটায়। তাদের ত্রাণের জন্য বিভিন্ন সংস্থা এগিয়ে আসে। নিষিদ্ধপল্লির মায়েরাও তাদের সাহায্যের জন্য রাস্তায় রাস্তায় কৌটা হাতে অর্থ সংগ্রহ করতে উদ্যোগী হয়। তাঁদের এই বন্যাত্রাণ তহবিল সংগৃহীত হয়েছিল ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থ অ্যান্ড হাইজিন উইমেন্স কোঅর্ডিনেশন কমিটি ও ৪৮নং ওয়ার্ডের মিলন সঙ্ঘের প্রচেষ্টায়। কলকাতার সংবেদনশীল নাগরিকদের উদ্যোগে এরকম বহু তহবিল গড়ে উঠেছিল। ছ'মাস ধরে চলেছিল এই অর্থ সংগ্রহের অভিযান, যাতে বন্যাদুর্গত মানুষদের সেবা করা যায়, তাদের সাহায্য করা যায়। কিন্তু একটি সংস্থা এগিয়ে আসেনি। আমাদের গর্ব, কলকাতার সঙ্গে সমার্থক মাদারের বহুজাতিক দানসত্র, 'মিশনারিজ অব চ্যারিটি'। মাদারের এই অনুপস্থিতি কলকাতাবাসীর চোখে পড়েনি। আসলে মাদার এই রকমই। বন্যার মতো বীভৎস বিপর্যয়ে পীড়িত মানুষের হাহাকার মাদার শুনতে পেতেন না। তিনি ভালবাসতেন ছোট ছোট দর্শনধারী সেবাকার্য। যখন কলকাতা সংলগ্ন বিস্তৃত অংশ বন্যার কবলে পড়েছে মাদার তখন কলকাতা থেকে বহুদূরে, সুদূর আমেরিকায়।

এরকম একবার নয়। পশ্চিমবঙ্গে, কলকাতার আশে-পাশে বার বার বন্যার ফলে বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু কেবল একবার ছাড়া মাদারের উপস্থিতি চোখে পড়েনি। দুর্গত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়নি চ্যারিটি হোমের কোনো সিস্টার বা ফাদার।

১৯৮৪-র ডিসেম্বরে শীতার্ত রাত্রে ভূপালের ইউনিয়ন কারবাইডের কারখানায় ভয়াবহ গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটে। পৃথিবীর অন্যতম ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। মারা যায় সাড়ে তিন হাজার মানুষ। অসুস্থ হয় আরও বেশি।

আজও ধুঁকছে বহু মানুষ।

মাদার তখন নোবেল পেয়েছেন। তিনি ছুটলেন ভূপালে। ভূপালের বাতাস তখন ভারি হয়ে উঠেছে বিষাক্ত গ্যাসে। সারি সারি চিতা জ্বলছে। বাতাসে দগ্ধ, অর্ধদগ্ধ মানুষের গন্ধ, ধোঁয়া। যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষের ক্লিষ্ট ব্যথিত চিৎকার, স্বজন-হারার শোক এবং পুঞ্জীভূত ক্রোধ। তিনি এসবের মাঝে এসে তিনবার ঘাড় নেড়ে বললেন,'আমি বলি, ক্ষমা করো।' যেমন আসা তেমনি চলে যাওয়া। কোনো সেবা শুশ্রূষা নয়, তাঁর সঙ্গে ছিলেন দু'জন সন্ন্যাসিনী, তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না সেবা কার্যে হাত দেওয়া। কলকাতার মতো ভূপালেও ছিল 'নির্মল হৃদয়'। নির্মল হৃদয়ের মুষ্টিমেয় সিস্টার ফাদারও সেবার কাজে হাত লাগায়নি। কোনো সেবা, সহায়তা দান নয়, শুধু মৌখিক স্তোকবাক্য, 'আমি বলি ক্ষমা কর', পীড়িত হতভাগ্য মানুষকে অপমান করা নয় কি?

ডেভিড পোর্টার মাদারের জীবনী নিয়ে একটি ছবি বানান। তাতে একটি দৃশ্যে দেখা যায় , মাদার ভূপালের এক অসহায় আর্ত মানুষের দিকে একটি গাঁদা ফুল এগিয়ে দিচ্ছেন। তলায় লেখা : 'মাদার এক গ্যাসাক্রান্তকে সাহায্য করছেন।'

তাহলে মাদারের সাহায্য একটি গাঁদাফুল? ১৯৯৩-এর সেপ্টেম্বরে এক ভয়ঙ্কর ভূ-কম্পনে কেঁপে উঠল মহারাষ্ট্রের লাতুর জেলা। প্রাণহীন হলো আট হাজার মানুষ, গৃহহীন হলো কয়েক লক্ষ মানুষ। বিপুল সম্পদের অপচয় হলো। সমগ্র পৃথিবীর সংবেদনশীল মানুষ আলোড়িত হলো এই ভয়াবহ ভূ-কম্পনে। ত্রাণ কাজে ছুটে গেল কমবেশি ২০০টির মতো সংগঠন। কিন্তু মাদার বা তাঁর মিশনারিজ অব্ চ্যারিটি? —'তোমার দেখা নাই রে তোমার দেখা নাই।'

১৯৯৪-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে লাতুরের পুনর্গঠনের কাজ চলছে পুরোদমে। মাদার তখন লাতুর থেকে বহুদূরে আমেরিকার নিউজার্সিতে। কী সেবা কাজ সেখানে তিনি করছেন? কী জরুরি কাজে আটকে পড়েছেন? আলেকজান্ডার লোস নামের এক বিত্তবান ব্যক্তি এক বিশ্রী মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন। তিনি এক নার্সিং হোমে বেআইনি ভাবে প্রবেশ করে তাঁর প্রাক্তন প্রণয়িনীকে গর্ভপাতে বাধা দিতে গিয়েছিলেন। মাদার তাঁর দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে 'হত্যে' দিচ্ছিলেন।

আসলে, কোনো মামলা যদি হয় গর্ভপাত-সংক্রান্ত তাহলে মাদারের উৎসাহের সীমা-পরিসীমা থাকে না। সে মামলা পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক, মাদার সশরীরে হাজির। ১৯৯৬-এর মে মাসে তাঁকে দেখা গেল ওয়াশিংটন ডিসি-তে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়। তিনি রিপাবলিকান প্রার্থী বব ডোলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি চান বব ডোল অতি কট্টর গর্ভপাত বিরোধী মঞ্চ গ্রহণ করুন। মাদার শুধু গর্ভপাত বিরোধীই নন, তিনি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণেরও বিরোধী। মাদার দরিদ্রের জননী। বিশ্ব তাঁকে এই ভাবেই চেনে। কিন্তু দারিদ্র্যের মূল কারণ যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি তিনি তাঁর নিয়ন্ত্রণ চান না। তিনি কী চান? একটি ভাষণে তিনি বলেছিলেন--- 'অনেকে আফ্রিকা বা ভারতের শিশুদের জন্য চিন্তিত হয়; যেখানে শিশুরা ক্ষুধার জ্বালায় মরে। কেউ কেউ আমেরিকায় হিংসার প্রকোপ দেখে চিন্তিত হয়। এসব দুশ্চিন্তা ভাল অবশ্যই। কিন্তু এইসব মানুষরা লক্ষ লক্ষ অনাগত মানুষের কথা চিন্তা করে না— যাদের হত্যা করে তাদের মায়েরাই।'

বোঝা যাচ্ছে মাদারের ভাবনার রাজ্যে অগ্রাধিকার পেয়েছে জীবিত, দুর্দশাগ্রস্ত শিশুরা নয়, অনাগত শিশুরা। মাদার কুষ্ঠরোগীর মধ্যে যিশুখৃস্টের সাক্ষাৎ পেতেন। কিন্তু সেই কুষ্ঠরোগীকে নিশ্চয় খৃস্টান হতে হবে। স্ট্রিট কিড ইন্টারন্যাশনালের প্রতিষ্ঠাতা কানাডার পিটার ডালগ্লিশের সঙ্গে ১৯৯১ খৃস্টাব্দে খার্তুমে মাদারের সাক্ষাৎ ঘটে। পিটার ঘুরে ঘুরে মাদারকে তাঁর সেবা প্রতিষ্ঠানের কাজ দেখান। তিনি দেখান শিশুদের জীবিকামূলক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যাতে বড়ো হয়ে তারা স্বনির্ভর হতে পারে। কিন্তু এইটুকুতেই মাদার সন্তুষ্ট হননি। তিনি পিটারকে জিজ্ঞাসা করেন— 'তুমি কি তাদের বাইবেল পড়াচ্ছ?'

অমৃতবাজার পত্রিকায় এস. কে. ঘোষ লিখেছেন— ''সাম্প্রতিককালে খৃস্টধর্মে ধর্মান্তর নিয়ে বিতর্কে মাদার টেরেজা এখন অসুবিধাজনক অবস্থায়।... কিন্তু মাদার টেরেজার কলকাতা ও ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। অন্য কোনো দেশ বা শহর তাঁকে এতো সহায়তা দেবে না এবং তঞ্চকতার দ্বারা ধর্মান্তরকে সমর্থন করবে না।''

২ নভেম্বর দি ফার ইস্টার্ন রিভিউ লিখেছে : ''কেউ তাঁর সংস্থার ছত্রছায়ায় এলে তাকে ক্যাথলিক করা হয়। রোমান ক্যাথলিকবাদে তিনি দীক্ষিত এবং এর জন্য যা করতে হয় তিনি তা করেন।'' মাদারের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী আনন্দবাজার পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন : ''আশ্রিতদের ক্যাথলিক ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য তিনি সূক্ষ্মভাবে চাপ দিতেন বলে সমালোচনা যথার্থ। সে অভিযোগ অবশ্য সব খৃস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধেই করা যায়।''

তিনি মাদার, তিনি বিশ্বজননী, তিনি করুণাময়ী মা, তিনি সেবার জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি, পীড়িতের সেবায় উৎসর্গ করেছেন তাঁর সমগ্রজীবন... যতই বিশেষণ দিই না, আমরা পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতাবাসীর মনের তৃপ্তি হয় না, খুঁজি আরও উপযুক্ত বিশেষণ। কিন্তু সবাই তো আর আমাদের মতো হবে না। যেমন, বৃটিশ সাংবাদিক ক্রিটোফার হিচেনস ও তারিক আলি। তাঁরা মিলিত ভাবে মাদারকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র বানান ১৯৯৪ সালে। তথ্যচিত্রটির নামকরণ হয় 'হেলস অ্যাঞ্জেল' অর্থাৎ কিনা 'নরকের দেবদূত'। তুমুল

সমালোচনা করা হয় এই তথ্যচিত্রে মাদারের কর্মকাণ্ড নিয়ে। যে সেবাকার্য নিয়ে মাদারের বিশ্বব্যাপী প্রচার ও খ্যাতি, সেই সেবাকার্যের অন্দরমহলের ছবিটি ফুটে উঠেছে এই তথ্যচিত্রে। মেরি লাউডন নামে এক প্রাক্তন স্বেচ্ছাসেবী এবং লেখিকাকে বলতে শোনা যায়, 'আমি দেখলাম একটি ঘরে সার দিয়ে অসুস্থ রোগী শুয়ে রয়েছেন। সকলেই ক্যানসারের শেষ পর্যায়ে। তাঁদের মধ্যে কেউ ওষুধ পাচ্ছেন, কেউ ওষুধ পাচ্ছেন না। ইঞ্জেকশন দেওয়ার সময় একই সিরিঞ্জ ও সূঁচ ব্যবহার করা হচ্ছে। সেগুলিকে ঠিকমতো সংক্রমণমুক্ত করা হচ্ছে না। কোনো কোনো সিস্টার তো সেগুলি ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে আবার ব্যবহার করছিলেন। আমি বিষয়টির প্রতিবাদ করায় তাঁরা আমাকে জবাব দেন, 'আমাদের অত সময় নেই।'

মিশনারিজ অব চ্যারিটি'র এই তাহলে তথাকথিত চ্যারিটির দৃষ্টান্ত! এদেশের গরিরবা, অসুস্থ, মুমূর্ষু, হতভাগ্যরা কি পরিষ্কার সিরিঞ্জ ও সূঁচ পেতে পারে না? সিস্টারদের হাতে সময় নেই। মানা যায়? সময় নেই, টাকাও কি নেই? তা কি বিশ্বাস্য? তিনি অর্থাৎ আমাদের 'মাদার' একবার মুখ খুললেই তো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ সিরিঞ্জ ও সূঁচ এসে পৌঁছে যাবার কথা।

কিন্তু 'মাদার' এসব নিয়ে ভাবেন না। কলকাতার ভিখারিদের অসুখ জটিল থেকে জটিলতর হলো, কী এইড্স হলো, কী হেপাটাইটিস-সি হলো, কী বেঘোরে মারা গেল— তা নিয়ে তাঁর ভাবতে বয়েই গেছে। কিংবা হয়তো ভুল বলা হলো। ভুল লিখলাম। তিনি ভাবেন, আন্তরিক ভাবে গভীর ভাবে ভাবেন। কিন্তু ভাবেন ভিন্ন ভাবে, অন্য ভাবে। 'মাদার'-এর নিজস্ব ধর্মসঞ্জাত বিশ্বাস— মানুষ যত কষ্ট পাবে ততই যিশুর কাছাকাছি আসবে।

'মাদার' এখানেও ব্যতিক্রমী। মানুষ কষ্ট পেলে যিশুর কাছে আসবে, অতএব মানুষ কষ্ট পাক। বেশি করেই পাক। এই ভাবনায় নিশ্চয় মানবিকতা নেই, মমত্বের লেশ নেই, মাতৃত্বের কোনো স্পর্শই নেই। যা আছে তা হলো— নির্ভেজাল নিষ্ঠুর ধর্মীয় কুসংস্কার। অপরপক্ষে, মানুষ ঈশ্বর বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, ঈশ্বরকে ডাকুক আর নাই ডাকুক, সরস্বতী নদীর তীরে বসবাসকারী আমাদের মহান আর্য ঋষিদের উদার, উদাত্ত কামনা :

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়ঃ।

সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ ভবেৎ।।

সকলের মঙ্গল হোক, সকলেই সুখী হোক, সকলেই আরোগ্য লাভ করুক। কেউ যেন দুঃখভোগ না করে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি হিন্দুরা তো মাদার বলতে অজ্ঞান। মাদারের শেষযাত্রার কথা ভাবলে চোখের কোণে এখনও জল চিক্ চিক্ করে। এই প্রসঙ্গে 'মাদার টেরেজা : মুখ ও মুখোশ' গ্রন্থের সম্পাদকীয়র অংশবিশেষ উদ্ধার করা গেল—

"...বাংলার বুদ্ধিজীবীরা মিশনারি প্রেমিক। স্বাভাবিকভাবেই মৃত টেরেজার বিরুদ্ধাচরণ করতে কেউ রাজি নন। ধর্মনিরপেক্ষ দেশে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে কোনো বিশুদ্ধ সত্য কথা বলাও পাপ। 'সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতা ফ্যাসিবাদ,' রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, ঋত্বিক ঘটক ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত হয়ে গেছেন। সাম্প্রদায়িক রূপে বর্ণিত হয়েছেন রবি-জীবনীকার প্রশান্ত কুমার পাল। সুতরাং কলকাতাকে গ্রহের কুৎসিততম স্থান করে কলকাতাবাসীদের ভিখারি ও কুষ্ঠরোগী বানিয়ে কলকাতার জন্য অর্থ ভিক্ষা করে ভ্যাটিকানের অর্থ ভাণ্ডার পুষ্ট করার জন্য 'মাদার টেরেজা'কে কেউ দুষতে রাজি নন। রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক পুষ্ট করার জন্য টেরেজার নামে রাস্তা বানাবে পার্ক বানাবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।"

'হিন্দু' কথাটি শুনলেই যাঁদের কান গরম হয়, চোখ লাল হয়, ভীষণ রেগে গিয়ে হাত পা ছোড়েন, যারা 'হিন্দুত্ব'-এর বিরুদ্ধে মিছিল, মিটিং করেন, সেমিনারে বক্তৃতা দেন, সন্ধেবেলায় টিভির বিভিন্ন চ্যানেলে সেজেগুজে বসেন, কাগজে শক্তিশালী প্রবন্ধ লেখেন, উপদেশ দেন, এসব কথা তাঁদের খারাপ লাগলেও কি অস্বীকার করতে পারেন? জানি, এসব কথা একপাশে রেখে তাঁরা আগামী সেপ্টেম্বরে আর একবার আবেগের বন্যায় ভাসবেন। এবার শুধু আনন্দাশ্রু। পীড়িতের সেবায় উৎসর্গীকৃত করুণাময়ী মাদার টেরেজা 'সন্ত' হতে চলেছেন। বাঙালির পক্ষে এটা কি কম গৌরবের!

তথ্যসূত্র :

১। মাদার টেরেজা : মুখ ও মুখোশ— অরূপ চট্টোপাধ্যায়। অনুবাদক : রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : আদিত্যরঞ্জন ঘটক, অমৃতশরণ প্রকাশন। ২। 'প্রণব' : অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা, ১৪১৫; ২০০৮। ৩। 'বর্তমান' ২৭ মার্চ, ২০১৬।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দুত্বের অবস্থান আরও দৃঢ় হলো

চিন্ময় ভট্টাচার্য

স্বামী বিবেকানন্দ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দুত্বের যে ধ্বজা তুলে ধরেছিলেন, সময়ের সঙ্গেই তা আরও পোক্ত হতে চলেছে। এই কথা প্রমাণ করল পশ্চিম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য, ক্যালিফোর্নিয়ার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের নির্দেশ। তিনি মার্কিন প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবইয়ে হিন্দুত্বকে আরও স্বচ্ছ ভাবে তুলে ধরতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন অনাবাসী ভারতীয়রাও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদ পাচ্ছেন। তবে ক্যালিফোর্নিয়ার বর্তমান লেফটেন্যান্ট গভর্নর অনাবাসী ভারতীয় নন। এমনকী এশীয়ও নন। তাঁর নাম গেভিন নিউসোম। তিনি মনে করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পাঠ্যবইয়ে হিন্দুত্বকে সঠিক এবং স্বচ্ছ ভাবে তুলে ধরা হয়নি। বরং, অনেকটাই নেতিবাচক ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। যার প্রভাব পড়ছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। তারা হিন্দুত্বকে সঠিক ভাবে জানতে পারছে না। হিন্দুত্বের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়কে গুলিয়ে ফেলছে। আর ঐতিহাসিক পরম্পরা মেনে ভ্রান্তির শিকার হচ্ছে।

এই ব্যাপারে ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট বোর্ড অফ এডুকেশনকে একটি চিঠিও দিয়েছেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর গেভিন নিউসোম। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন এবং হিন্দু-মার্কিনদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিবেচনা করার জন্য আমি আন্তরিক ভাবে আপনাদের উৎসাহিত করছি। আপনারা নজর দিলে, অন্য ধর্মের বিচ্যুতি এবং সামাজিক সমস্যার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা হিন্দুত্বকে গুলিয়ে ফেলবে না। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তৈরি হওয়া বিভ্রান্তি দূর করতে গেলে, পাঠ্যবইয়ে হিন্দুত্বকে সঠিক এবং স্বচ্ছ ভাবে তুলে ধরতে হবে। যদি আপনারা আমার সঙ্গে একমত না-ও হন, আমি আশা করব যে আপনারা পাঠ্যবইয়ে হিন্দুত্বের বিষয়টি সঠিক ভাবে পরিমার্জন করবেন।'

লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিউসোমের এই চিঠিতে স্বাভাবিক ভাবেই বুকে বল পেয়েছেন অনাবাসী ভারতীয় ও হিন্দু মার্কিনরা। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা দিনকে দিন বাড়ছে। সনাতন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বহু খৃস্টান মার্কিন হিন্দুত্বের শরণ নিচ্ছেন। ক্যালিফোর্নিয়াতেও বহু হিন্দু-মার্কিনের বাস। তাঁরাও লেফটেন্যান্ট গভর্নরের এই নির্দেশে খুশি। তাঁরা মনে করছেন, পাঠ্যবইয়ে সঠিক ভাবে তুলে ধরা হলে, ভারত থেকে দূরে থেকেও তাঁদের ছেলে-মেয়েরা হিন্দুত্বকে সঠিক ভাবে জানতে পারবে। চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে ক্যালিফোর্নিয়া বোর্ড অফ এডুকেশনের বৈঠক। লেফটেন্যান্ট গভর্নরের নির্দেশ মেনে সেই বৈঠকে পাঠ্যবই পরিমার্জন নিয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া বোর্ড অফ এডুকেশন। বৈঠকে ইতিহাস এবং সোশ্যাল সায়েন্সের বইগুলোর পরিমার্জন নিয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা হবে।

শুধু লেফটেন্যান্ট গভর্নরই নন। অন্য একটি চিঠিতে ৪০ জন মার্কিন শিক্ষাবিদও ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট বোর্ড অব এডুকেশনের কাছে হিন্দুত্বকে সঠিক ভাবে পাঠ্যসূচিতে তুলে ধরার অনুরোধ করেছেন। পাশাপাশি, তাঁরা বয়স অনুযায়ী শিক্ষার ব্যাপারে নজর দিতেও বোর্ডকে অনুরোধ করেছেন। এই শিক্ষাবিদদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক বারবারা এ ম্যাকগ্রাও। তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার সেন্ট মেরিজ কলেজের সোশ্যাল এথিকস, আইন এবং পাবলিক লাইফ বিভাগের অধ্যাপক। চিঠিতে তাঁরা লিখেছেন, 'যেমন ভাবে আমরা অন্য সভ্যতা এবং ধর্মকে প্রতিফলিত করি, তেমনি ভাবে আমাদের সকলের হিন্দুত্ব এবং ভারতকেও তুলে ধরা প্রয়োজন। বাস্তবে এখনও পর্যন্ত সেটা হয়নি।'

অন্য একটি চিঠিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিন্দু-আমেরিকান ফাউন্ডেশন (এইচ এ এফ), হিন্দুত্বকে যেভাবে পাঠ্যবইয়ে চিত্রিত করা হয়েছে, তাই নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তাঁরা মনে করছেন, ভ্রান্তিপূর্ণ এবং পক্ষপাতদুষ্ট ভাবে হিন্দুত্বকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাঠ্যবইয়ে তুলে ধরা হয়েছে। যা আসলে বাস্তবকেই উপেক্ষা করছে। এই ভ্রান্তি আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধাচারণ বলেই হিন্দু-আমেরিকান ফাউন্ডেশন মনে করছে। হিন্দু-আমেরিকান ফাউন্ডেশনের এই অভিযোগের ভিত্তিতে ১২ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ তুলসী গাবার্ড সরব হয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভের প্রথম হিন্দু প্রতিনিধি তুলসী গাবার্ড হাওয়াইয়ের প্রতিনিধি। তিনি অভিযোগ করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ান এডুকেশন বোর্ড হিন্দুত্ব, প্রাচীন ভারত এবং ধর্মকে সঠিক ভাবে পাঠ্যবইয়ে চিত্রিত করেনি। এই ব্যাপারে অবিলম্বে উদ্যোগ নিতে তুলসী গাবার্ড ক্যালিফোর্নিয়ার এডুকেশনাল বোর্ডকে অনুরোধ করেছেন। ■

রেশমকন্যা পতিরাই

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রেশম উৎপাদনে বিশ্বে চীনের পরই স্থান ভারতের। ভারতের রেশম উৎপাদক শীর্ষস্থানীয় পাঁচটি রাজ্যের (কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, জম্মু ও কাশ্মীর) পরেই আছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা। এখানকার উন্নতমানের মালবেরি সিল্ক খুবই জনপ্রিয়। তবে ত্রিপুরার এই সিল্ক-খ্যাতির নেপথ্যে রয়েছে সে রাজ্যেরই এক পর্বত-কন্যার প্রচেষ্টা যিনি তুঁতভিত্তিক রেশম চাষে বিপ্লব ঘটিয়েছেন।

জুমিয়া উপজাতির এই কন্যা দারিদ্র্যকে সঙ্গী করেই পঞ্চাশের দশকে জন্মান। দারিদ্র্যক্লিষ্ট পরিবারে বাবা মোহন সিং রুপিনী ও মা দশলক্ষ্মী তখন সন্তানদের মুখে দু'মুঠো ভাত তুলে দিতেও অপারগ। বাবা চাষবাস করলেও রাজনৈতিক আন্দোলন সফল করতে পার্টির কাজে তখন পাহাড়-সমতলে ছুটে বেড়াচ্ছেন। পার্টিনেতা মোহন ওই সময়েই জন্ম নেওয়া এই মেয়ের নাম তাই রাখলেন কমিউনিস্ট পতিরূপিণী। যদিও লোকমুখে তিনি পতিরাই নামেই অধিক পরিচিত। সংসারে দারিদ্র্য ঘোচাতে চম্পকনগরে পতিরাই পরিবার শুরু করলো তাই এরিপোকার চাষ। কিন্তু তাতে যা লাভ তাতে পুরো সংসারের ভরণপোষণ হয় না। তাই অর্থাভাবে পড়াশোনায় প্রবল আগ্রহ থাকলেও স্কুলের মুখ দেখা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। একটু বড় হওয়ার পরই মান্দাই-য়ের ভৃগুদাসবাড়িতে বিয়ে হয়ে যায় পতিরাইয়ের। এদিকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও এরিপোকার চাষ করত। সেখানেও সেই কষ্টের সংসার। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও দশ সন্তানের মুখে ভাত তুলে দিতে অপারগ। সংসার চালানোর জন্য কাঠ কাটা, বাঁশ কাটা, ধান মাড়াই-য়ের কাজ সবকিছুই করতে হোত। তবুও সংসার চালানো ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়েছিল। এরপর যখন ৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সরকারি প্রচেষ্টায় গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের অধীনে তুঁত ভিত্তিক রেশম চাষ শুরু হলো, তখন সেই কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পতিরাই। শ্রমনিবিড় এই চাষে তিনি তার প্রতিবেশী মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করলেন। তার স্বামী, ভাসুর ও আরও তিনজন প্রথম এই চাষ শুরু করেন। এই চাষে উৎসাহ দেওয়ার জন্য গ্রামে মেয়েদের নিয়ে একটি সোসাইটি গড়ে ওঠার পর জঙ্গল পরিষ্কার করে তুঁত চাষ শুরু হলো। এখন তারা তুঁত গাছের চারা তৈরি করে পরিবার পিছু বছরে প্রায় ৩০-৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করছেন।

এখন আবার রেশমপোকা পালন করছেন। কর্মচঞ্চল পতিরাই অবসর সময়েও বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে রেশমকীটের খোলা থেকে মেয়েদের সাজের জিনিস বানান। এখন তিনি স্বনির্ভর। নিজের টাকায় মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন। নিজের অপূর্ণ শিক্ষার স্বাদ নাতি-নাতনিদের মধ্যে দিয়ে অনুভব করার জন্য তাদের স্কুলে ভর্তি করেছেন।

রেশমচাষে বিপ্লব আনার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৪ সালে তিনি লাভ করেছেন 'Women achiever in Sericulture' সম্মান। এছাড়াও ৩৮তম কক্‌বরক দিবসে তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়। গণতন্ত্র দিবসে Ministry of Tribal Affairs ও Tribal Cultural Heritage Meet-ও তাকে সম্মানে ভূষিত করে। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির হাত থেকে সম্মান স্মারক পেয়ে অসম্ভব খুশি এই রেশম-কন্যা। ষাটের গোড়ায় এসেও জীবনে কিছু করার স্বপ্ন তিনি এখনও দেখেন। তাই তাংবিতি আর যাপনকতিমার সুরে কথায় যখন আকাশে সন্ধ্যা নামে তখনও আকাশের সন্ধ্যাতারার দিকে দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল রেশম সুতোর মতোই উজ্জ্বল স্বপ্ন বুনে চলেন পতিরাই। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

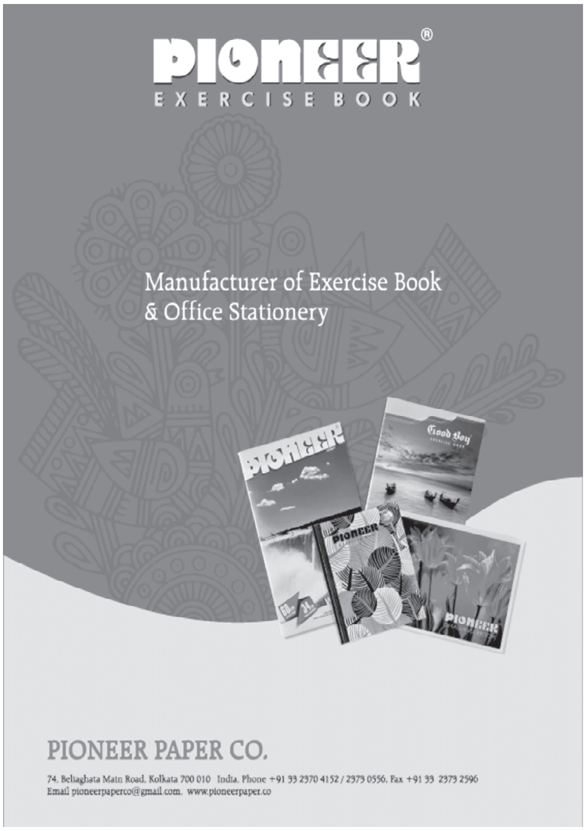

এই শিশুকৃষ্ণের প্রতিকৃতিকেই ভারতীয় মাতা ঠিক শিশু যীশুর মতো পূজা করেন, গো-চারণে যান বলে তাঁকে গোপাল বলে ডাকেন। তাঁর নাম ভাগবতকথায়, কবিতার ছন্দে, হিন্দুদের সকল লোকগীতিতে ওতপ্রোত, সেখানে সখাগণ সঙ্গে ক্রীড়ারত গোপবালকরূপে তাঁর লীলা বর্ণিত। আশ্চর্যজনকভাবে, য়ুরোপীয় সাহিত্যে শিশু খৃষ্টের গল্পের মতো ভারতের শিশুসাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কাহিনীতে পূর্ণ। আবার, মধুরভাবের সাধকের কাছে তিনি এক স্বর্গীয় প্রেমিক।'

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

ফুসফুসের ক্যান্সার ও হোমিও চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

সারা পৃথিবীতে এক লক্ষ মানুষের মধ্যে আশি থেকে নব্বই জন ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। গ্রামের থেকে শহরে প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক ফুসফুসের ক্যান্সার রোগী দেখা যায়। ফুসফুসের ক্যান্সার সাধারণত শ্বাসনালীর ঘা বা তার আবরণী কোষ থেকে হয়। প্রধানত এপিডারময়েড বা স্কোয়ামাস কোষ কারসিনোমা ছোট কোষ বা ওট কোষ কারসিনোমা, এডোনোকারসিনোমা এবং বড় কোষ বা অ্যানাপাস্টিক কারসিনোমা দেখা যায়। এই রোগে পুরুষ ও স্ত্রী প্রায় সমানভাবেই আক্রান্ত হন।

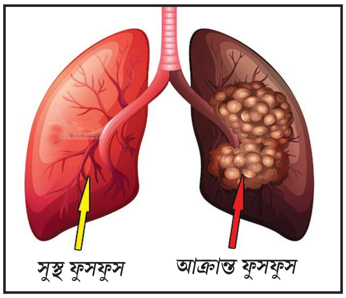

এ পর্যন্ত জানা গেছে ধূমপানই ফুসফুসের ক্যান্সারের মূল কারণ। বৃটিশ গবেষক স্যার রিচার্ড জন প্রমাণ করে দিয়েছেন যে যদি আপনার দশ বছরের বেশি ধূমপানের অভ্যাস থাকে তবে ফুসফুসের ক্যান্সারের সম্ভাবনা দশগুণের বেশি বেড়ে যাবে। এটা হবে দিনে পাঁচটি সিগারেট পান খেলেই। এও জানা গেছে, ফিলটার সিগারেট, সাধারণ সিগারেট, সিগার, পাইপ, বিড়ি যাই খান না কেন সমস্যা কমবে না। জানা গেছে পাঁচ বছর ধূমপানের অভ্যাস থাকলেই ফুসফুস বা শ্বাসনালীতে ক্যান্সারের প্রাথমিক পরিবর্তনগুলো শুরু হয়।

ধূমপান ছাড়া পরিবেশ এবং বায়ুমণ্ডলের দূষণ, কারখানা, গাড়ির ধোঁয়া ফুসফুসের ক্যান্সার ত্বরান্বিত করে বলে জানা গেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন বায়ুমণ্ডলের দূষণ সম্পূর্ণভাবে এড়ানো প্রায় অসম্ভব বিশেষ করে শহরে, তখন ধূমপান সম্পূর্ণভাবে বর্জন করাই ফুসফুসের ক্যান্সার এড়ানোর একমাত্র উপায়।

ফুসফুসের ক্যান্সারের লক্ষণ :

এপিডারময়েড এবং ছোট কোষ ক্যান্সার ধূমপায়ীদের কাশি, হুইজিং, শ্বাসকষ্ট, কাশির সঙ্গে রক্ত এবং বুকে ব্যথা।

এডোকারসিমোনা এবং বড় কোষ ক্যান্সার— জ্বর, দুর্বলতা, ক্ষিদেমন্দা ও ওজন কমে যায়।

গাইনিকোমাসটিয়া বড় কোষ ক্যান্সারের কারণে হয়।

হাইপারট্রফিক পালমোনারি অস্টিও আথ্রোপ্যাথি অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হরমোন তৈরির কারণে কার্টিলেজ ক্ষয়ে যায় বা কোষ ক্যান্সার ও এডানোকারসিনোমার কারণে হয়।

শ্বাসনালীর অবরোধ, কাশির সঙ্গে রক্ত, শ্বাসকষ্ট, নিউমোনাইটিস এবং এটেল কটোসিস।

রোগ নির্ণয় :

কফ পরীক্ষা করে ৭৫ শতাংশ রোগ ধরা সম্ভব। সূঁচ বায়োপসি করা যেতে পারে। পুরাল বায়োপসি, সুপ্রাক্ল্যাভিকুলার ও মেডিকাস্টিনাল গ্রন্থি বায়োপসি করে রোগ ছড়িয়েছে কিনা জানা যায়। এছাড়া টোমোগ্রাফি, কিনা জানা যায়। এছাড়া টোমোগ্রাফি, ব্রংকোগ্রাফি, ইসোফোগোগ্রাফি, এনজিও কার্ডিগ্রাফিও করা প্রয়োজন।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা :

ক্যালি কার্বনিকাম : ডান দিকের ফুসফুস ক্যান্সারে খুব ভাল কাজ করে। রাত্রি তিনটের সময় শুষ্ক কঠিন কাশি তৎসহ সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা ও গলবিলের শুষ্কতা, সমস্ত বুক অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ, শ্লেষ্মা অল্প ও চটচটে, ডানদিকের বুকের নিম্নাংশে বেশি আক্রান্ত হয় এবং আক্রান্ত অংশ চেপে বক্ষস্থলের শোর্থ। সামনের দিকে ঝুঁকে থাকলে বুকের উপসর্গসমূহের উপশম হয়। বুকের ভিতর শীতলতার অনুভূতি। সাঁই সাঁই শব্দে কাশি-সহ আলজিহ্বার শিথিলতা, বারে বারে ঠাণ্ডা লাগা, উষ্ণ আবহাওয়ায় কষ্টের উপশম হয়।

থুজা : ফুসফুস ক্যান্সারে উভয় ধরনের এপিডারময়েড (ছোট কোষ) ক্যান্সার ও এডেনোকারসিনোমা (বড় কোষ) ক্যান্সারে, যে-কোনো দিকের ফুসফুস আক্রান্ত হলে বিশেষত বাম দিকের ফুসফুসেই খুব ভাল কাজ হয়। বুকে ব্যথা ঠাণ্ডা জলপানে বৃদ্ধি, শুষ্ক কষ্টকর কাশি, বেলা তিনটায় সকাল তিনটায় টিকা দেওয়ার কুফলে বৃদ্ধি।

ক্যালি-রাইক্রোমিকাম : বুকে ব্যথা, প্রচুর হলুদ বর্ণের শ্লেষ্মা অতীব আঠালো চটচটে, স্রাব গাঢ় টানলে দাড়ির মতো লম্বা হয়। সবুজে হলুদ বর্ণের স্রাব, ঘুংড়ি কাশি, তৎসহ বক্ষাস্থির বেদনা, বেদনা কাঁধ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। জামাকাপড় খোলার পর বৃদ্ধি, কাশির সময় বায়ুনালীর বিকশিত অংশে বেদনা, বুকের মধ্যস্থান থেকে পিঠ পর্যন্ত বেদনা বৃদ্ধি গরম আবহাওয়ায় সকালে কমে।

ফসফরাস : ফুসফুসের রক্তাধিক্য, বুকের ভিতর জ্বালাকর বেদনা, বুকের উপরে কষ্টভাব, বুকের ভিতরে তাপরোধ, প্রচণ্ড ভারী বোধ, শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত ও বাধাগ্রস্ত, বামদিকে চেপে শুলে বৃদ্ধি, কাশির সঙ্গে সারা শরীর কাঁপে, শ্লেষ্মা মরচে পড়ার মতো রং যুক্ত। কাশির সঙ্গে বারে বারে রক্ত ওঠে। রোগের বৃদ্ধি— গরম খাবার অথবা পানীয়ে, বামদিকে উপশম— ডানদিকে চেপে শুলে বৃদ্ধি পায় কষ্ট।

কোবাল্টাম মিউরিয়েটিকাম : কোবাল্ট খনিতে যারা চাকরি করেন তাদের ফুসফুস ক্যান্সারে খুব ভাল কাজ করে। বুকে তির বিদ্ধ বেদনা, সামনের দিকে ঝুঁকলে বৃদ্ধি।

এরকম অনেক কষ্ট আছে লক্ষণভিত্তিকভাবে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যাবে। তবে কখনই চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ না করে ওষুধ খাওয়া উচিত নয়।

যোগাযোগ—৯৮৩০০২৩৪৮৭

ফঃ৫

SURYA FOUNDATION

Tel. : 011-25262994, 25253681
Email : suryafnd@gmail.com Website : www.suryafoundation.net.in

सूर्या फाउण्डेशन युवाओं के समग्र विकास तथा प्रशिक्षण के लिए अब एक जानी-मानी संस्था बन चुकी है। इसका प्रमुख उद्देश्य है देश के प्रति निष्ठा रखते हुए अनेक तरह के उत्तरदायित्व निभाने के लिए तेजस्वी, लगनशील तथा धुन के पक्के नवयुवकों का निर्माण करना। **संघ संस्कारों** में पले-बढ़े, सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले, शारीरिक रूप से सक्षम तरुणों के सूर्या फाउण्डेशन में प्रवेश हेतु निम्न categories में Cadres का इंटरव्यू होगा-

1. Under Graduate Trainee (UGT) / Graduate Staff Trainee (GST)

- **न्यूनतम योग्यता** - 12वीं में 50% अंकों से पास BCA, B.Sc., B.Com, BBA, BA में पढ़ रहे विद्यार्थी जो 1st Year या IInd Year पास हों चुके हैं, या 2016 में होने वाली IIIrd Year (Final) परीक्षा देने वाले भैया आवेदन कर सकते हैं। कम्प्यूटर में कोई भी विशेष योग्यता प्राप्त आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। **आयु 21 वर्ष** से अधिक न हो।
- Training की अवधि 2 महीने की रहेगी। जो **"सूर्या साधना स्थली"** सूर्या फाउण्डेशन कैम्पस में होगी। जिसमें कम्प्यूटर, इंग्लिश स्पीकिंग, मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, ध्यान, कराटे, विभिन्न खेल, फौजी ट्रेनिंग आदि का प्रशिक्षण मिलेगा। इस दौरान 3,000/- प्रतिमाह Stipend व फ्री भोजन तथा आवास रहेगा।
- सूर्या साधना स्थली की ट्रेनिंग के बाद एक साल के लिए On Job Training (OJT) पर रखा जाएगा जिसमें आवास और भोजन के साथ 5,000/- प्रतिमाह मानधन (Stipend) के रूप में दिया जायेगा।
- इस पूरी ट्रेनिंग के बाद 10,000/- प्रतिमाह का मासिक वेतन दिया जायेगा जिसमें performance को देखते हुए हर साल बढ़ोतरी की जायेगी। ट्रेनिंग पूरी होने के पश्चात देश के हित में, सूर्या फाउण्डेशन आदर्श गाँव योजना, सामाजिक कार्यों या सूर्या के अन्य प्रकल्पों में जोड़ा जाएगा।
- SC, ST, OBC, दलित, पिछड़े व वनवासी एवं North East (पूर्वोत्तर) के युवकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. Graduate Management Trainee (GMT)

योग्यता- 2016 में 10वीं या 11वीं या 12वीं की परीक्षा पास करने वाले भैया आवेदन कर सकते हैं। पिछली कक्षा में न्यूनतम अंक 60% तथा गणित में 75% अंक प्राप्त किए हों। **आयु :** 18 वर्ष से कम। सूर्या ट्रेनिंग सेंटर में 6 माह की प्रारंभिक ट्रेनिंग के बाद **OJT / PCT** में भेजा जायेगा। **OJT / PCT के साथ-साथ ग्रेजुएशन और MBA / MCA करने की सुविधा दी जायेगी।** प्रारंभिक 6 महीनों की ट्रेनिंग के दौरान भोजन और आवास की सुविधा फ्री रहेगी। साथ ही 3000/- प्रतिमाह स्कॉलरशिप मिलेगा। On Job Training के दौरान आवास तथा पढ़ाई के साथ-साथ **11वीं में 6000/- और 12वीं में 7000/- Graduation 1st year में 9000/-, IInd Year में 10500/-, IIIrd Year में 12000/-, MBA/MCA 1st Year में 15000/-, MBA/MCA IInd Year में 20000/- Stipend** प्रतिमाह मिलेगा। **MBA/MCA पूरा होने के बाद 30000/- (CTC)** प्रतिमाह वेतन मिलेगा।

3. Assistant Staff Cadre (ASC)

योग्यता- 2016 में 10वीं या 11वीं या 12वीं की परीक्षा देने वाले भैया आवेदन कर सकते हैं। पिछली कक्षा में न्यूनतम अंक 55% एवं गणित में 60% अंक प्राप्त किए हों। **आयु :** 18 वर्ष से कम। सूर्या ट्रेनिंग सेंटर में 6 माह की प्रारंभिक ट्रेनिंग के बाद **OJT / PCT** में भेजा जायेगा। प्रारंभिक 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान 3000/- प्रतिमाह Stipend मिलेगा तथा फ्री भोजन और रहने की व्यवस्था होगी। **तीन वर्ष की OJT / PCT** के दौरान **Stipend - 1st year : 6000/-** प्रतिमाह व आवास, **IInd year : 7000/-** प्रतिमाह व आवास, **3rd year : 8000/-** प्रतिमाह व आवास। **After training 11000/- (CTC)** प्रतिमाह वेतन मिलेगा।

(आवेदन अलग कागज पर हिंदी या अंग्रेजी में ही भरकर भेजें)

Affix latest Photograph here

पूरा नाम .... जन्मतिथि (अंको में) ....
पिता का नाम ....
पिता का व्यवसाय .... मासिक आय ....
भाई कितने हैं (आप को छोड़कर) .... बहनें कितनी हैं.......... जाति ....वर्ग..........
विवाहित / अविवाहित ....
पढ़ाई का विवरण (Mark Sheet की फोटोकॉपी साथ जोड़ें) ....
पत्र व्यवहार का पता .... पिन कोड .... टेलीफोन नं॰ .... Mobile No. :..........Email ....
NCC / NSS / OTC / ITC / शीत शिविर / PDC (कोई शिविर किया है तो उल्लेख करें) .... शिविर में दायित्व
सेवा भारती / विद्या भारती / वनवासी कल्याण आश्रम के किसी विद्यालय / छात्रावास या संघ या परिषद अथवा विविध क्षेत्रों से संबंध रहा है तो कब और कैसे .... दायित्व..........
सूर्या परिवार में कोई परिचित है तो! नाम एवं विभाग ....
सूर्या फाउण्डेशन के इंटरव्यू में पहले भाग ले चुके हैं तो वर्ष तथा कैडर का नाम ....

अपनी विशेष क्षमता, योग्यता, गुण एवं उपलब्धि अवश्य लिखें। इसके अतिरिक्त अपने विषय में कोई अन्य जानकारी देना चाहें तो अलग पेज पर लिखकर भेजें।

कृपया विस्तारपूर्वक बॉयोडाटा के साथ निम्न पते पर आवेदन करें। Category 1 के आवेदनकर्ता इसके अतिरिक्त अपना detailed CV भी साथ में भेजें।

सूर्या फाउण्डेशन : बी-3/330, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063

विज्ञापन छपने के एक माह के अंदर आवेदन करें।

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের জেলা সম্মেলন

গত ১০ জুলাই বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের (মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক) জলপাইগুড়ি জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সারা ভারতে একই জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তন, শিক্ষায় শাশ্বত জীবন মূল্য ও আধ্যাত্মিক তথা নৈতিক শিক্ষা পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে সভায় আলোচিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডল, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায় ও রাজ্য কোষাধ্যক্ষ গোপীনাথ ব্যানার্জী। সম্মেলনে একটি জেলা কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি : অজিত পাল, সম্পাদক : খগেন্দ্রনাথ বর্মন ও সহ সভাপতি রমেশ রায়কে নিয়ে ১০ জনের একটি কমিটি গঠিত হয়। এই সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন ডিসেম্বর ২০১৬-তে অনুষ্ঠিত হবে। সম্ভাব্য স্থান মালদহ শহর।

এছাড়া শিলিগুড়িতেও একটি সভায় এই সংগঠনের দু'জন আহ্বায়ক নিযুক্ত করা হয়।

অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার কার্যকারী সমিতির অধিবেশন

অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার জাতীয় কর্মসমিতির অধিবেশন জব্বলপুরে গত ৯-১০ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একশো জনের অধিক সদস্য এতে অংশগ্রহণ করেন। ২০১৯ সালে সংগঠনের ২৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এখন থেকেই সদস্যদের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আলোচনা সভা, পত্র-পত্রিকা এবং গ্রন্থ প্রকাশ ইত্যাদির উপর অধিক সক্রিয় হবার নির্দেশ দেন সর্বভারতীয় সংগঠনের কার্যকারী সম্পাদক ড. বালমুকুন্দ পাণ্ডে। রানি দুর্গাবতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কপিলদেও মিশ্র ব্যক্তিগতভাবে সর্বক্ষণ উপস্থিত থেকে অধিবেশনে পথনির্দেশ করেন। বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ রাজ্যে বিগত বছরের সংগঠনের কার্যাবলীর বিবরণ দেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে মোট ছ'জন এই অধিবেশনে যোগ দেন। পশ্চিমবঙ্গের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিবরণ দেন এই রাজ্যে সংগঠনের সম্পাদক অমিতাভ সেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি ড. নিখিলেশ গুহ, সহ-সভাপতি বিশ্বভারতীর ড. হরেকৃষ্ণ মিশ্র, কার্যকারী সম্পাদক প্রদীপ চক্রবর্তী প্রমুখ। সভায় সমাপ্তি ভাষণ দেন হরিভাউ ভাজে এবং সংস্থার বর্তমান সভাপতি ড. সতীশ মিত্তাল।

পরলোকে অধ্যাপক তরুণ মজুমদার

জুন মাসের শেষ সপ্তাহে অধ্যাপক তরুণ মজুমদার আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সংগঠনের ক্ষেত্র তিনি এক নবযুগের সূচনা করেছেন। গত ৪০ বৎসর ধরে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের অনুমোদন ব্যতীত কোনো কৃতী অধ্যাপক রাজ্যের দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত হতে পারেননি। তার প্রমাণ তরুণবাবু। তিনি ১৯৫২ সালে জোতি বসুর বরানগর কেন্দ্রে চিফ ইলেকশন এজেন্ট ছিলেন। তিনি সত্যপ্রিয় রায়ের সহকারী হিসেবে এবিটিএ-র বি.এড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হন। এক বছর বাদেই তিনি পার্টির অসহযোগিতার জন্য পদত্যাগ করেন। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে যোগ দেন উপাচার্য সন্তোষ ভট্টাচার্যের সহযোগিতায়। তারপর থেকেই তরুণবাবু শিক্ষকদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ভাবনা জাগ্রত করার জন্য শিক্ষক সংগঠন গড়ার কাছে এগিয়ে আসেন, তিনি গড়ে তোলেন জাতীয় অধ্যাপক মঞ্চ। মঞ্চের প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলন হয় কলকাতায় ১৯৯৭ সালে মহারাষ্ট্র নিবাস হলে।

সেই সম্মেলন উদ্বোধনের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য। এই প্রথম সম্মেলনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক অধ্যাপক রাজেন্দ্র সিংহ শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণা করেন। এই সম্মেলনে বাংলার ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৪০ কলেজের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। তরুণবাবুর মৃত্যুতে বাংলার শিক্ষক আন্দোলনে একটি বিরাট স্থান রিক্ত হলো। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর স্ত্রী, এক কন্যা, জামাতা ও দুই নাতি রেখে গেছেন।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সাহাপুর শাখার স্বয়ংসেবক তথা পুরাতন মালাদা নগরের ব্যবস্থা প্রমুখ সঞ্জয় কুমার পালের বাবা সুনীল চন্দ্র পাল গত ১০ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি স্ত্রী, পুত্র, ২ পুত্রবধু, ২ কন্যা, ২ জামাতা ও নাতিনাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর বীরভূম জেলার মল্লেশ্বর খণ্ডের মেহিদনগর শাখার মুখ্যশিক্ষক মনোরঞ্জন পালের বাবা গজানন পাল গত ১৭ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

উত্তর বীরভূম জেলার মল্লেশ্বর খণ্ডের মেহিদনগর শাখার স্বয়ংসেবক গোষ্ঠহরি পালের মাতৃদেবী গত ১৮ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি ৪ পুত্র ৪ কন্যা ও নাতি নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

গত ২০ জুলাই বিকেলে কনকলতা দে পরলোক গমন করেন। বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বৎসর। তিনি এক পুত্র ও পাঁচ কন্যা-সহ নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তাঁর পরিবারের সকলেই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। কলকাতা মহানগরের কার্যবাহ শশাঙ্কশেখর দে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র। সকল স্বয়ংসেবকের কাছেই তিনি মাতৃসমা ছিলেন।

এ যেন পাঁকে পদ্ম

বিকাশ ভট্টাচার্য

এ যেন পাঁকে পদ্মফুল। জনশ্রুতি মা ছিলেন নিষিদ্ধপল্লীর। রজবালা ও রতন চন্দ্র দাসের মেয়ে কানন। তাঁর আত্মজীবনী 'সবারে আমি নমি' পড়ে জানা যায় তাঁর জন্ম ২২ এপ্রিল ১৯১৬। তিনি হাওড়ার এক কনভেন্ট স্কুলে পড়েছেন। মাত্র দশবছর বয়স যখন কাননের তখন রতন দাস মারা যান। মেয়েকে নিয়ে মা পড়লেন অগাধ জলে। দারিদ্র্যের চরম সীমায় যখন দাঁড়িয়ে তখন পরিবারের এক শুভাকাঙ্ক্ষী তুলসী ব্যানার্জী, কানন যাঁকে কাকাবাবু বলতেন, তিনি তাকে নিয়ে এলেন ম্যাডান থিয়েটার বা জ্যোতি স্টুডিওতে। তখন জয়দেব (১৯২৬) ছবির শুটিং চলছে। কানন সেই নির্বাক ছবিতে ছোট্ট একটা পার্ট পেলেন। তিনি বলতেন, 'যে বয়সে পুতুল খেলে মেয়েরা, তখন আমি অভিনয় করে রোজগার করতে নেমেছিলাম'। এখানে তিনি টানা সাত বছরে 'ঋষির প্রেম', 'জোর বরাত', 'বিষ্ণুমায়া', 'প্রহ্লাদ' প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করেন। এরপর তিনি তিন বছর রাধা ফিল্মে অভিনয় করেন। নায়িকা হিসেবে তাঁর চরম খ্যাতি নিউ থিয়েটার্সে এসে। এখানে প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে তাঁর জুটি দর্শকের প্রশংসা পায়। নিউ থিয়েটার্সের 'মুক্তি' ছবিতে গানে অভিনয়ে কানন দেবী সবাইকে অবাক করে দেন। এ ছবির নায়ক ছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া ও পরিচালনাও তাঁর।

কানন দেবীর প্রথম বিবাহ ১৯৪০ -এর ডিসেম্বরে অক্সফোর্ড ফেরত বিশ্বভারতীর অধ্যাপক অশোক মৈত্রের সঙ্গে। রীতিমতো বেশ কিছুদিন প্রেমপর্ব চলার পর বিবাহ। এই অবিশ্বাস্য বিয়ে কাননবালাকে এক লহমায় কানন দেবী করে দিল। কিন্তু এই বিয়ে বেশীদিন টেকেনি। পাঁচ বছরের মধ্যে বিয়ে ভেঙে গেল। স্কলার অশোক চেয়েছিলেন বিয়ের পর তাঁর স্ত্রী গান ও অভিনয় ছেড়ে সংসারধর্ম পালন করবেন। আর কাননদেবী সেটা করলেন না বলেই সম্পর্কটা টিকল না। প্রসঙ্গত বলি, অশোকের বাবা ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এবং বোন রাণী মহলনাবিশ, প্রশান্তচন্দ্র মহলনাবিশ যাঁর স্বামী।

কানন ছবির পাশাপাশি গান রেকর্ড করে গেছেন পরপর। গান শিখেছেন রথী-মহারথীদের কাছে। অনাদি দস্তিদারের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত। এছাড়া কাজী নজরুল, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজ মল্লিক, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, তারাপদ চক্রবর্তী। 'মুক্তি' ছবি সুপারহিট হওয়ার পর প্রশান্তচন্দ্র মহলনাবিশ কাননের সঙ্গে কবির আলাপ করিয়ে দেন। কবি শান্তিনিকেতনে এসে কাননকে গান শোনাতে বলেছিলেন। কিন্তু সে সৌভাগ্য আর কানন দেবীর হয়নি। তাঁর সমসাময়িক আর যে নায়িকারা ছিলেন যেমন, যমুনা দেবী, লীলা দেশাই, মলিনা দেবী, চন্দ্রাবতী দেবী প্রমুখ। এঁদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান জানিয়েই বলি এঁদের কারও কানন দেবীর মতো স্ক্রিন প্রেজেন্স ছিল না। সমস্ত বড়বড় নায়কদের সঙ্গে তিনি অভিনয় করেছেন। প্রমথেশ বড়ুয়া, কে. এল. সাইগল, পঙ্কজ মল্লিক, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ি সান্যাল, অশোক কুমার প্রমুখ।

১৯৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কৈলাশনাথ কাটজুর এডিসি ক্যাপ্টেন হরিদাস ভট্টাচার্যের সঙ্গে কাননের বিয়ে হয়। এটি দ্বিতীয় বিবাহ। ওঁদের পরিচালনায় শ্রীমতি পিকচার্স-এর বিভিন্ন ছবি তো বাংলার দর্শকদের স্মরণে থাকার কথা। শ্রীমতী পিকচার্সের পরপর ছবি হিট। এ ছবিরই গান 'প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম' কাননদেবীর চিরকালীন সুপারহিট। হরিদাস ভট্টাচার্য স্বাধীনভাবে পরিচালনায় এলেন 'নববিধান' ও 'দেবত্র'-য়। দেবত্র ছবিতে কানন দেবীর সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন। এরপর 'আঁধারে আলো', 'রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত', এবং একটি থ্রিলার ছবি 'শেষ অঙ্ক'। প্রযোজিকা হিসেবেও তিনি চরম সফল।

কানন দেবীর একটা আক্ষেপ ছিল প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে 'দেবদাস' (১৯৩৫) ছবিতে অভিনয় করতে পারেননি। প্রমথেশ তাঁকে পার্বতী চরিত্রে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন তিনি রাধা ফিল্মস-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। তারা তাঁকে ছাড়েনি। চুক্তি শেষে তিনি নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেন এবং প্রথম অভিনয় 'মুক্তি'তেই। এই 'মুক্তি'তেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের গান ব্যবহার করেন প্রমথেশ আর যে গান গাইলেন কানন দেবী। একটা ইতিহাস। গানটি 'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে'। রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসারে তাঁর অবদানও ছিল অতুলনীয়। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গান— 'তুফান মেল', 'আমি বনফুল গো', 'আমি আপনার মনে' প্রভৃতি। রবীন্দ্র ভারতীর সাম্মানিক ডি. লিট সহ এই শিল্পী পদ্মশ্রী ও দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে ভূষিত। একাধিকবার তিনি বি.এফ.জে পুরস্কারও পেয়েছেন।

এক কথায় কানন দেবী তাঁর সময়ের এক সুপারস্টার। অপূর্ব সুন্দরী, ব্যক্তিত্বময়ী প্রযোজিকা, গায়িকা ও নায়িকা সে যুগে আর একজনও ছিলেন না। সামাজিক কাজেও তাঁর অবদান ভুলবার নয়। দুঃস্থ কলাকুশলীদের সাহায্যে তাঁর একটি সুপার হিট নাটক ছিল 'মিশর কুমারী'। সংগৃহীত অর্থ দিয়ে দুঃস্থ ডিফেন্স ফান্ডে নিজের স্বর্ণালঙ্কার দান করেন। সে দান গ্রহণ করেন স্বয়ং প্রফুল্ল সেন। ১৯৯২-এর ১৭ জুলাই বেলভিউ ক্লিনিকে এই অবিস্মরণীয় শিল্পী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ■

কানন থেকে কাননবালা দেবী

আশিস রায়

কাননদেবী খুব কষ্টে বড় হয়েছেন। তাঁর আত্মজীবনী 'সবারে আমি নমি' পড়তে পড়তে কখনও মনে হয় যে গজেন্দ্র কুমার মিত্রের 'কলকাতার কাছেই' উপন্যাস পড়ছি আবার কখনও মনে হয় চ্যাপলিনের 'My Autobiography'র পাতায় প্রবেশ করেছি। মা নেই, বাবা নেই, খাওয়া-দাওয়া নেই, ঝি-গিরি করে, বাড়িতে বাড়িতে মাথা ঠুকে কানন থেকে কাননবালা এবং তারপরে কাননদেবী হয়ে ওঠা বাংলা সিনেমার সবচেয়ে বড় সাফল্যের নজির।

শোনা কথা ছাড়া কাননদেবীর ছোটবেলার কথা জানার উপায় নেই। মেখলা সেনগুপ্তর 'Kanan Devi : The First Superstar of Indian Cinema' বইয়ে জানা যায় বালিকা কাননকে প্রথম পাওয়া যায় হাওড়ার এক গরিব পাড়ায়। হাওড়ার এক কনভেন্ট স্কুলে তাঁর নাম লেখানো হয়েছিল, কিন্তু মাইনে দেওয়া যায়নি বলে তাঁকে আর ওই স্কুলে পড়ানো যায়নি। অন্য আর একটি সূত্রে জানা যায় কাননকে শিশু অবস্থায় ভাগলপুরে গঙ্গা তীরবর্তী রাজবাটি আদমপুরের পোস্তা বাগানবাড়িতে পাওয়া যায়। সেটা ছিল শীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসতবাড়ি। শিশু কাননকে কলকাতার হাড়কাটা গলি থেকে তাঁর কাছে আনা হয়। তিনি পেশায় উকিল ছিলেন। পাঁচ কিংবা ছ' বছর বয়সে কাননকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় সিনেমায় নেমে বা গান গেয়ে রুজিরোজগার করতে। আবার অনেকের কাছ থেকে শোনা যায় তাঁর বাবা ছিলেন দর্জি। মা ছিলেন বাঈজি। তাঁর গানের গলা ছিল খুব ভাল কিন্তু পেট চালাতে হোত বাড়ি বাড়ি পরিচারিকার কাজ করে।

কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে কাননকে বড় করে তুলেছেন রাজবালাদেবী ও রতনচন্দ্র দাস। তাঁর আত্মকথায় তাঁদের মা ও বাবা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অমিয়া নামে এক দিদির কথারও উল্লেখ আছে। কিন্তু বাড়িটা কোথায় ছিল তা জানা যায়নি। রাজবালা নাকি বিভিন্ন ঠিকানায় কাজের লোক ছিলেন, কাননকে তাঁর কাছে রাখা হয়েছিল বড় করে তোলার জন্য, তিনি কাননের জন্মদাত্রী মা ছিলেন না। কাননদেবী স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর বাবা ও মা হয়তো বিয়েই করেননি। তারা শুধু সহবাস করেছেন। রতনচন্দ্রের টাকা রেসে, তাসের জুয়ো ও মদ্যপানে ডুবেছিল। মার্চেন্ট অফিসে চাকরি করতেন। একটি সোনার দোকানও ছিল। অকালে গত হওয়ায় রাজবালাকে পরিচারিকার জীবনে হঠাৎ করে নেমে আসতে হয়। কারণ রতনচন্দ্রের যাবতীয় সম্পত্তি তার আত্মীয়রাই দখল করে। এই সীমিত ক'বছরের মধ্যে তিনি কাননের মধ্যে দুটি বিষয় সৃষ্টি করে গেছেন— বইয়ের প্রতি আর গানের প্রতি টান। বই পড়ে আর গান শুনে কাননের মধ্যে তৈরি হলো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নেচে গেয়ে নায়িকা সাজা।

কাননকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে বড়লোকের বাড়িতে রান্না, ঘর ঝাড়া, কাপড় কাচার কাজে লাগানো হলো। পড়াশুনা ও খেলার সময় নেই, খাওয়া জোটে এক বেলা, সারাক্ষণ পেটে খিদে থাকতো। রাজবালার শরীর ভেঙে যেতে লাগলো কিন্তু কাননের পরির মতো রূপে আঁচড়টি পড়লো না। এই ভয়ানক পরিস্থিতি সামাল দিতে তাঁদের চন্দননগরে এক অবস্থাপন্ন আত্মীয়ের বাড়িতে উঠে যেতে হলো। কাননদেবী তাঁর আত্মীয়দের নাম জানাননি। অনেকের ধারণা এই আত্মীয় কাননের দিদি অমিয়া। ওই বাড়িতে মা-মেয়ের কাজের বহর আর গালমন্দ শোনার রুটিন বাঁধিয়ে রাখার মতো। সেখান থেকে বেরিয়ে কানন ও রাজবালার জায়গা হলো হাওড়ার ঘোলাডাঙ্গা পল্লিতে সেটা এখন ছোট ব্যবসায়ীদের আড়ত। চারপাশের পরিবেশ ভাল ছিল না। কিন্তু তার মধ্যেই কাননের নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা হয়েছিল। এক রোগা মধ্যবয়সি বিপত্নীক ভোলাদা রোজ সন্ধ্যায় হারমোনিয়াম নিয়ে ভক্তিগীতি শুরু করলে কাননের সামনে এক নতুন জগৎ খুলে যেত। ভোলাদা কাননকে কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, ব্রহ্মসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদের গান ইত্যাদি শোনাতেন। কানন মুগ্ধ হয়ে শুনতো। একদিন হঠাৎ ভোলাদা নিজেই কোথায় হারিয়ে গেলেন। তখন কাননের আশ্রয় হলেন সেকালের আশ্চর্যময় কণ্ঠের গায়িকা আশ্চর্যময়ী দাসী। কাননের বাড়ির পাশেই থাকতেন। কাননের অপরূপ চেহারা আর অপূর্ব কণ্ঠে তিনি মুগ্ধ হলেন। তাঁকে গানের জগতে আনার জন্য তিনি তালিম দিতে লাগলেন। কাননদেবীর স্মতিচারণায় এই মহিলাকে 'বৌদি' বলা হয়েছে।

কাননদেবী শুধু বায়োস্কোপের যুগের স্বপ্নসুন্দরী নন, তাঁর জীবন নির্বাক ছবির আগে শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কাননের গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। রাইবাবু কাননকে দিয়ে প্রথম লাইভ গাওয়ালেন বাংলা ছবিতে। নিজের মতো গানটা গেয়ে গেলেন। কোনো যন্ত্র নেই, কিছুই নেই। যন্ত্র ছাড়া এভাবে গাইতে পারতেন সায়গল। 'জয়দেব' ছবির পর আর একটি ছোট রোল পেয়েছিল কানন 'শংকরাচার্য' ছবিতে। কাননের কপালে পুরো পারিশ্রমিক জোটেনি। এরপর বেশ কয়েক বছর হাতে কোনো কাজ ছিল না কাননের। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যে ভূমিকা না করার হতাশা ছেড়ে যায়নি কাননদেবীকে তা হলো প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস'-এর পার্বতী ভূমিকা। প্রমথেশবাবুর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রাধা ফিল্মসের আপত্তিতে কাননের পার্বতী হওয়া হয়নি। 'দেবদাস' একাধারে ক্লাসিক ও হিট হওয়ার পর কাননদেবী প্রমথেশবাবুকে সাধুবাদ জানান। তাঁর পরবর্তী ছবি 'মুক্তি'তে কাননদেবী প্রথম রবীন্দ্রনাথের গান গাইলেন। ছবি ভীষণ হিট হলো এবং কাননদেবীর সেরা অভিনয় প্রমাণিত হলো। ■

শব্দরূপ-৭৯৮ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

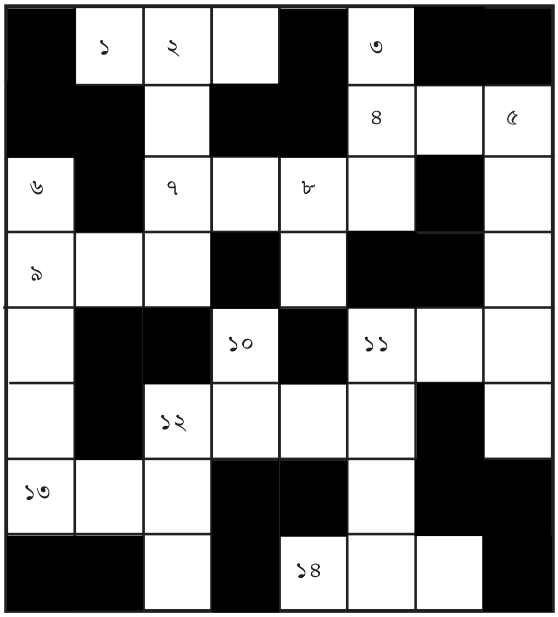

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** শিলা, পাথর, **৪.** শীতল মরুভূমির দেশ, লে-র রাজধানী, **৭.** কোমল চিক্কণ বস্ত্রবিশেষ, **৯.** অবধি, সীমা, **১১.** বেগুন, **১২.** চাঁদমারির জন্য মাটির উচ্চস্তূপ, **১৩.** কেশর, পরাগ, **১৪.** গান, কবিতা ইত্যাদির আরম্ভ।

উপর-নীচ : **২.** শুভ লক্ষণসূচক, **৩.** হিন্দি প্রতিশব্দে আবির, **৫.** অজীর্ণজনিত উদগার, **৬.** নিজ খরচে নিজের খোরাক সংগ্রহ করতে হয় এমন, **৮.** ব্রহ্মার পুত্র; ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা বিশেষ ('— সংহিতা'), **১০.** একটি সাধারণ ফল, **১১.** তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতি বিশেষ যাতে পঞ্চ-মকার আবশ্যক, **১২.** এই পাহাড় থেকে দামাল হাতির দল প্রায়ই নেমে আসে।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৯৫

অ	হ	ং	কা	র			নে
ব			র	জ			পা
দা			বা	কি		শী	ল
ত	ব			নি	যে	ক	
	জ	রি	প			র	বে
গো	রা		দ	হ			লা
সা			কা	ন			বে
বা			র	সু	ল	আ	লি

সঠিক উত্তরদাতা

সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬
শ্যামল সরদার
ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

৭৯৮ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৯ আগস্ট ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

যদি আপনি প্রকৃত গণতন্ত্রের পূজারি হন তাহলে নিজের অন্তরাত্মার নির্দেশ ব্যতীত কাউকে ভোট দিতে পারেন না। রাজনৈতিক দল যারা জনতার জন্য কাজ করে, তারা জনতার শক্তিতেই দাঁড়িয়ে থাকে। জনতা চায় তাকে যেন কেউ দাবিয়ে রাখতে না পারে। সেজন্য জনতাকে শক্তি প্রদান করা জরুরি। জনতাই রাজনৈতিক দল ও তার মাধ্যমে রাজনৈতিক লক্ষ্য প্রাপ্ত করার কারিগর।

কিন্তু ভালো দল কোনটি? দল শুধু কিছু মানুষের একত্রিত হওয়া নয়। বরং ক্ষমতা হস্তগত করার ইচ্ছা ছাড়াও বিশেষ উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত একটি সংস্থা। এরকম দলের সদস্যদের রাজনৈতিক ক্ষমতা সাধ্য নয়, সাধন হওয়া প্রয়োজন। দলের ছোট-বড় সব কার্যকর্তার কোনো উদ্দেশ্যের প্রতি নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন। নিষ্ঠা থেকে সমর্পণ ও অনুশাসনের ভাবনা উৎপন্ন হয়। অনুশাসনের অর্থ কেবল কোনো কাজ একসঙ্গে করা বা না করার বাহ্যিক একরূপতা নয়। উপর থেকে যতই অনুশাসন চাপানো হবে দলের অভ্যন্তরীণ শক্তি ততই কম হতে থাকবে। সমাজের জন্য ধর্ম যেমন অপরিহার্য, তেমনি দলের জন্য অনুশাসন অপরিহার্য।

ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলকে তাদের একটি দর্শন (সিদ্ধান্ত অথবা আদর্শ)-এর ক্রমিক বিকাশে তৎপর থাকা একান্ত আবশ্যক। তাদের 'কিছু লোকের স্বার্থপূর্তির উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া দল' হলে চলবে না। তাদের কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা জয়েন্ট স্টক কোম্পানি থেকে আলাদা হতে হবে। দলের দর্শন কেবল দলের ইস্তাহারের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। সদস্যদের বোঝাতে হবে যে, তাদের কেবল জনহিতের জন্য নিষ্ঠাপূর্বক একত্রিত হওয়া প্রয়োজন।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ১

ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তালিকায় কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর ইউনেসকো চণ্ডীগড়ের ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স এবং সিকিমের কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্ককেও বিশ্ব হেরিটেজের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করল। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কাউন্সিলের চল্লিশতম অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গুপ্তসম্রাট কুমারগুপ্তের আমলে তৈরি হয় এবং কালক্রমে এর নাম সমগ্র এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্ক একই সঙ্গে প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কেন্দ্র। এই পার্কে যেমন রয়েছে সবুজ সমতল, উপত্যকা আর পাহাড়ি হ্রদ, তেমনি এদের ঘিরে রয়েছে প্রাচীন অরণ্য আর বিশ্বের তৃতীয় উচ্চতম পর্বতশিখর— কাঞ্চনজঙ্ঘা। নালন্দার মতো এই অঞ্চলও বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। চণ্ডীগড়ের ক্যাপিটাল কমপ্লেক্সে রয়েছে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা এই দুই রাজ্যের হাইকোর্ট, সচিবালয় এবং বিধানসভা ভবন। এছাড়া রয়েছে শহিদ মিনার এবং বিখ্যাত ছায়ামিনার।

ফ্যাট-কার্বহাইড্রেটের মাত্রা কমিয়ে ভাত এখন আরও স্বাস্থ্যকর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভাত শুধু ভারতের নয় পৃথিবীর অনেক দেশেরই প্রধান খাদ্য। কিন্তু আধুনিক স্বাস্থ্যসচেতন মানুষ ভাতে কার্বহাইড্রেটের পরিমাণ নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন। এক কাপ ভাতে ক্যালরির পরিমাণ ২০০। এই ক্যালরি দ্রুত সুগার এবং মেদে রূপান্তরিত হয়। যার ফলে ডায়াবেটিস এবং হার্টের সমস্যার সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে বলে ডাক্তারবাবুদের অভিমত। ভাত খেতে যারা ভালোবাসেন তাঁদের জন্য সুখবর। টেনশন করার আর কোনো দরকার নেই। ভাত রান্নার পদ্ধতিতে সামান্য দুটো পরিবর্তন করলেই ভাতের কার্বহাইড্রেট কমিয়ে তাকে স্বাস্থ্যকর করে তোলা সম্ভব। শ্রীলঙ্কার স্নাতকস্তরের ছাত্র সুধের জেমস এই অভিনব আবিষ্কারটি করেছে। অধ্যাপক পুষ্পরাজা থাওয়ারাজার অধীনে চাল নিয়ে গবেষণার সময় সে ভাত রান্নার এই নতুন ফর্মুলাটি সম্বন্ধে অবগত হয় যা এক ধাক্কায় ভাতের কার্বহাইড্রেটের মাত্রা কমিয়ে দিতে সক্ষম। সব থেকে বড়ো ব্যাপার, সুধেরের ফর্মুলা প্রয়োগ করার জন্য ভাত রান্নার সাবেক পদ্ধতিতে বিরাট কোনো পরিবর্তন করতে হয় না। তফাত শুধু এইটুকু, জলটা আগে ফুটিয়ে নিতে হবে তারপর তাতে মেশাতে হবে কয়েক ফোটা নারকেল তেল। নারকেল তেলের পরিমাণ হবে যত গ্রাম চাল তার ৩ শতাংশ। এরপর দিতে হবে চাল। বাকি পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন নেই। সুধের জানিয়েছে, নারকেল তেল দেওয়ার ফলে চালের ক্ষতিকর স্টার্চের প্রকৃতি বদলে নিয়ে তা শরীরের পক্ষে সহনশীল হয়ে ওঠে। কার্বহাইড্রেটের পরিমাণ কমে যায়। সুগার বা মেদের কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

২৮টি ঐতিহাসিক স্মারক দেশে ফিরল

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ১৯৭৬-এ শুরু। তারপর থেকে ক্রমাগত অনুরোধ-উপরোধ করেও বিদেশি রাষ্ট্রের কাছে গচ্ছিত দেশের ঐতিহাসিক স্মারকগুলি ফিরিয়ে আনা যায়নি। মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ ব্যাপারে বিশেষ জোর দিয়েছিল। যার ফল, বিশ্বের ৭টি দেশ থেকে ২৮টি প্রত্নদ্রব্য ভারতে ফিরে এসেছে। শুধু আমেরিকা থেকেই ফিরেছে ১৮টি প্রত্নদ্রব্য। অন্য দেশগুলির মধ্যে রয়েছে ইংল্যান্ড (৪টি), অস্ট্রেলিয়া (২টি), কানাডা (১টি), ফ্রান্স (১টি), জার্মানি (১টি), নেদারল্যান্ডস (১টি)। ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে তামিলনাড়ু ফেরত পেয়েছে সর্বাধিক ১২টি প্রত্নদ্রব্য। এছাড়া মধ্যপ্রদেশ পেয়েছে ৩টি, বিহার ২টি, জম্মু-কাশ্মীর ২টি, নাগাল্যান্ড ২টি এবং অন্ধ্রপ্রদেশ পাঞ্জাব হরিয়ানা রাজস্থান উত্তরপ্রদেশ উত্তরাখণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ ১টি করে প্রত্নদ্রব্য। ফেরত দেওয়া প্রত্নদ্রব্যগুলির মধ্যে রয়েছে মূলত প্রাচীন মূর্তি ও চিত্রকলা।

সবার প্রিয়
বিল্লদা
চানাচুর
‘বিল্লদাকুঞ্জ’
কালিকাপুর,
বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
1 August - 2016 - Rs. 10.00,

দাম : ১০.০০ টাকা